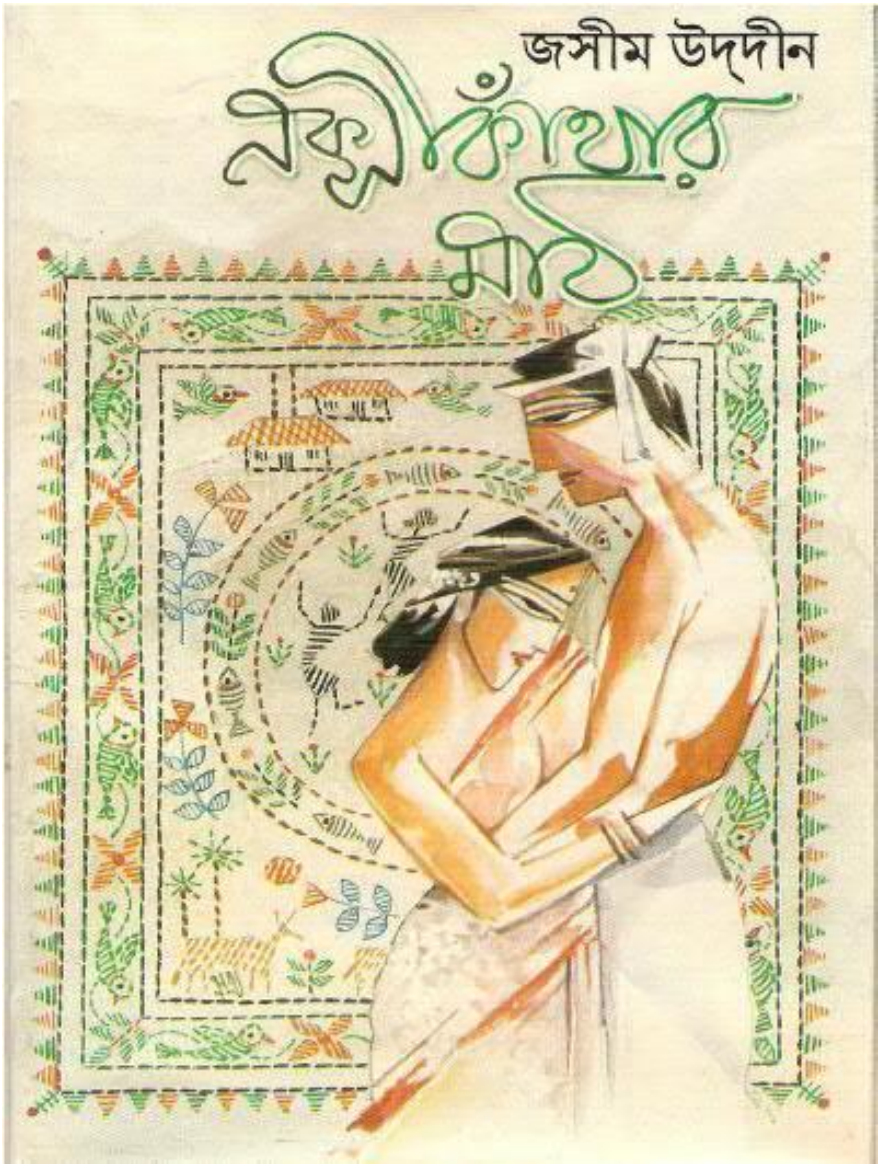

নক্সী কাঁথার মাঠ

কবি জসীমউদ্দিন

পল্লীকবি নামে খ্যাত জসীমউদ্দিন-এর জন্ম ১৯০৪ সালে বাংলাদেশের ফরিদপুরের তাম্বুলখানা গ্রামে। পিতা আনসার উদ্দিন মোল্লা, এবং মাতা আমিনা খাতুন। ১৯৭৬ সালের ১৩ মার্চ ঢাকায় তাঁর মৃত্যু হয়।

নক্সী-কাঁথার মাঠ রচয়িতা শ্রীমান্ জসীমউদ্‌দীন নতুন লেখক, তাতে আবার গল্পটি একেবারে নেহাৎই যাকে বলে-ছোট্ট এবং সাধারণ পল্লী-জীবনের। শহরবাসীর কাছে এই বইখানি সুন্দর কাঁথার মতো করে বোনা লেখার কতটা আদর হবে জানি না। আমি এইটিকে আদরের চোখে দেখেছি, কেন না এই লেখার মধ্য দিয়ে বাংলার পল্লী-জীবন আমার কাছে চমৎকার একটি মাধুর্য্যময় ছবির মতো দেখা দিয়েছে। এই কারণে আমি এই নক্সী-কাথাঁর কবিকে এই বইখানি সাধারণের দরবারে হাজির করে দিতে উৎসাহ দিতেছি। জানি না, কিভাবে সাধারণ পাঠক এটিকে গ্রহণ করবে; হয়তো গেঁয়ো যোগীর মতো এই লেখার সঙ্গে এর রচয়িতা এবং এই গল্পের ভূমিকা-লেখক আমিও কতকটা প্রত্যাখান পেয়েই বিদায় হব। কিন্তু তাতেও ক্ষতি নেই বলেই আমি মনে করি, কেননা ওটা সব নতুন লেখক এবং তাঁদের বন্ধুদের অদৃষ্টে চিরদিনই ঘটে আসতে দেখেছি।

শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬
জোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

নক্সী কাঁথার মাঠ - কবি জসীমউদ্দিন

এক

বন্ধুর বাড়ি আমার বাড়ি মধ্যে ক্ষীর নদী,
উইড়া যাওয়ার সাধ ছিল, পাঙ্খা দেয় নাই বিধি।
--- রাখালী গান

এই এক গাঁও, ওই এক গাঁও --- মধ্যে ধু ধু মাঠ,
ধান কাউনের লিখন লিখি করছে নিতুই পাঠ ।
এ-গাঁও যেন ফাঁকা ফাঁকা, হেথায় হোথায় গাছ ;
গেঁয়ো চাষীর ঘরগুলি সব দাঁড়ায় তারি পাছ।
ও-গাঁয় যেন জমাট বেঁধে বনের কাজল কায়া,
ঘরগুলিরে জড়িয়ে ধরে বাড়ায় বনের মায়া।

এ-গাঁও চেয়ে ও-গাঁর দিকে, ও-গাঁও এ-গাঁর পানে,
কতদিন যে কাটবে এমন, কেইবা তাহা জানে!
মাঝখানেতে জলীর বিলে জ্বলে কাজল-জল,
বক্ষে তাহার জল-কুমুদী মেলছে শতদল।
এ-গাঁর ও-গাঁর দুধার হতে পথ দুখানি এসে,
জলীর বিলের জলে তারা পদ্ম ভাসায় হেসে!
কেউবা বলে --- আদ্যিকালের এই গাঁর এক চাষী,
ওই গাঁর এক মেয়ের প্রেমে গলায় পরে ফাঁসি ;
এ-পথ দিয়ে একলা মনে চলছিল ওই গাঁয়ে,
ও-গাঁর মেয়ে আসছিল সে নূপুর-পরা পায়ে!

এইখানেতে এসে তারা পথ হারায়ে হায়,
জলীর বিলে ঘুমিয়ে আছে জল-কুমুদীর গায়ে।
কেইবা জানে হয়তো তাদের মাল্য হতেই খসি,

শাপলা-লতা মেলছে পরাগ জলের উপর বসি।
মাঠের মাঝের জলীর বিলের জোলো রঙের টিপ,
জ্বলছে যেন এ-গাঁর ও-গাঁর বিরহেরি দীপ !
বুকে তাহার এ-গাঁর ও-গাঁর হরেক রঙের পাখি,
মিলায় সেথা নতুন জগৎ নানান সুরে ডাকি।
সন্ধ্যা হলে এ-গাঁর পাখি ও-গাঁর পানে ধায়,
ও-গাঁর পাখি এ-গাঁয় আসে বনের কাজল ছায়।
এ-গাঁর লোকে নাইতে আসে, ও-গাঁর লোকেও আসে
জলীর বিলের জলে তারা জলের খেলায় ভাসে।

এ-গাঁও ও-গাঁও মধ্যে ত দূর --- শুধুই জলের ডাক,
তবু যেন এ-গাঁয় ও-গাঁয় নেইকো কোন ফাঁক।
ও-গাঁর বধু ঘট ভরিতে যে ঢেউ জলে জাগে,
কখন কখন দোলা তাহার এ-গাঁয় এসে লাগে।
এ-গাঁর চাষী নিঘুম রাতে বাঁশের বাঁশীর সুরে,
ওইনা গাঁয়ের মেয়ের সাথে গহন ব্যথায় ঝুরে !
এ-গাঁও হতে ভাটীর সুরে কাঁদে যখন গান,
ও-গাঁর মেয়ে বেড়ার ফাঁকে বাড়ায় তখন কান।
এ-গাঁও ও-গাঁও মেশামেশি কেবল সুরে সুরে ;
অনেক কাজে এরা ওরা অনেকখানি দূরে।

এ-গাঁর লোকে দল বাঁধিয়া ও-গাঁর লোকের সনে,
কাইজা ফ্যাসাদ্ করেছে যা জানেই জনে জনে।
এ-গাঁর লোকেও করতে পরখ্ ও-গাঁর লোকের বল,
অনেকবারই লাল করেছে জলীর বিলের জল।
তবুও ভাল, এ-গাঁও ও-গাঁও, আর যে সবুজ মাঠ,
মাঝখানে তার ধূলায় দোলে দুখান দীঘল বাট ;

দুই পাশে তার ধান-কাউনের অথই রঙের মেলা,
এ-গাঁর হাওয়ায় দোলে দেখি ও-গাঁয় যাওয়ার ভেলা।

দুই

এক কালা দতের কালি যা দ্যা কলম লেখি,
আর এক কালা চক্ষের মণি, যা দ্যা দৈনা দেখি,

. ---ও কালা, ঘরে রইতে দিলি না আমারে।
. --- মুর্শিদা গান

এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে লম্বা মাথার চুল,
কালো মুখেই কালো ভ্রমর, কিসের রঙিন ফুল!
কাঁচা ধানের পাতার মত কচি-মুখের মায়া,
তার সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া ।
জালি লাউয়ের ডগার মত বাহু দুখান সরু,
গা-খানি তার শাঙন মাসের যেমন তমাল তরু।
বাদল-ধোয়া মেঘে কে গো মাখিয়ে দেছে তেল,
বিজলী মেয়ে পিছলে পড়ে ছড়িয়ে আলোর খেল।
কচি ধানের তুলতে চারা হয়ত কোনো চাষী,
মুখে তাহার ছড়িয়ে গেছে কতকটা তার হাসি ।

কালো চোখের তারা দিয়েই সকল ধরা দেখি,
কালো দতের কালি দিয়েই কেতাব কোরাণ লেখি।
জনম কালো, মরণ কালো, কালো ভূবনময় ;
চাষীদের ওই কালো ছেলে সব করেছে জয়।

সোনায় যে জন সোনা বানায়, কিসের গরব তার'
রঙ পেলে ভাই গড়তে পারি রামধণুকের হার ।
কালোয় যে-জন আলো বানায়, ভুলায় সবার মন,

তারি পদ-রজের লাগি লুটায় বৃন্দাবন।
সোনা নহে, পিতল নহে, নহে সোনার মুখ,
কালো-বরণ চাষীর ছেলে জুড়ায় যেন বুক।
যে কালো তার মাঠেরি ধান, যে কালো তার গাঁও!
সেই কালোতে সিনান করি উজল তাহার গাও।

আখড়াতে তার বাঁশের লাঠি অনেক মানে মানী,
খেলার দলে তারে নিয়েই সবার টানাটানি।
জারীর গানে তাহার গলা উঠে সবার আগে,
"শাল-সুন্দী-বেত" যেন ও, সকল কাজেই লাগে।
বুড়োরা কয়, ছেলে নয় ও, পাগাল লোহা যেন,
রূপাই যেমন বাপের বেটা, কেউ দেখেছ হেন?
যদিও রূপা নয়কো রূপাই, রূপার চেয়ে দামী,
এক কালেতে ওরই নামে সব গাঁ হবে নামী।

তিন

ওই গাঁখানি কালো কালো, তারি হেলান দিয়ে,
ঘরখানি যে দাঁড়িয়ে হাসে ছোনের ছানি নিয়ে ;
সেইখানে এক চাষীর মেয়ে নামটি তাহার সোনা,
সাজু বলেই ডাকে সবে, নাম নিতে যে গোনা।
লাল মোরগের পাখার মত ওড়ে তাহার শাড়ী,
ভোরের হাওয়া যায় যেন গো প্রভাতী মেঘ নাড়ি।
মুখখানি তার ঢলঢল ঢলেই যেত পড়ে,
রাঙা ঠোঁটের লাল বাঁধনে না রাখলে তায় ধরে।
ফুল-ঝর-ঝর জন্তি গাছে জড়িয়ে কেবা শাড়ী,
আদর করে রেখেছে আজ চাষীদের ওই বাড়ি।
যে ফুল ফোটে সোণের খেতে, ফোটে কদম গাছে,
সকল ফুলের ঝলমল গা-ভরি তার নাচে।

কচি কচি হাত পা সাজুর, সোনায় সোনার খেলা,
তুলসী-তলায় প্রদীপ যেন জ্বলছে সাঁঝের বেলা।

গাঁদাফুলের রঙ দেখেছি, আর যে চাঁপার কলি,
চাষী মেয়ের রূপ দেখে আজ তাই কেমনে বলি ?
রামধনুকে না দেখিলে কি-ই বা ছিল ক্ষোভ,
পাটের বনের বউ টুবাণী, নাইক দেখার লোভ।
দেখেছি এই চাষী মেয়ের সহজ গেঁয়ো রূপ,
তুলসী-ফুলের মঞ্জরী কি দেব-দেউলের ধূপ!
দু একখানা গয়না গায়ে, সোনার দেবালয়ে,
জ্বলছে সোনার পঞ্চ প্রদীপ কার বা পূজা বয়ে!
পড়শীরা কয়---মেয়ে ত নয়, হলদে পাখির ছা,
ডানা পেলেই পালিয়ে যেত ছেড়ে তাদের গাঁ।

এমন মেয়ে---বাবা ত নেই, কেবল আছেন মা ;
গাঁওবাসীরা তাই বলে তায় কম জানিত না।
তাহার মতন চেরন "সেওই" কে কাটিতে পারে,
নক্সী করা পাকান পিঠায় সবাই তারে হারে।
হাঁড়ির উপর চিত্র করা শিকেয় তোলা ফুল,
এই গাঁয়েতে তাহার মত নাইক সমতুল।
বিয়ের গানে ওরই সুরে সবারই সুর কাঁদে,
"সাজু গাঁয়ের লক্ষ্মী মেয়ে" --- বলে কি লোক সাধে?

চার

চৈত্র গেল ভীষণ খরায়, বোশেখ রোদে ফাটে,
এক ফোঁটা জল মেঘ চোঁয়ায়ে নামল না গাঁর বাটে।
ডোলের বেছন ডোলে চাষীর, বয় না গরু হালে,
লাঙল জোয়াল ধূলায় লুটায় মরচা ধরে ফালে।
কাঠ-ফাটা রোদ মাঠ বাটা বাট আগুন লয়ে খেলে,
বাউকুড়াণী উড়ছে তারি ঘূর্ণী ধূলী মেলে।
মাঠখানি আজ শূণ্য খাঁ খাঁ, পথ যেতে দম আঁটে,
জন্-মানবের নাইক সাড়া কোথাও মাঠের বাটে :
শুকনো চেলা কাঠের মত শুকনো মাঠের ঢেলা,
আগুন পেলেই জ্বলবে সেথায় জাহান্নামের খেলা।

দরগা তলা দুগ্ধে ভাসে, সিন্নি আসে ভারে :
নৈলা গানের ঝঙ্কারে গাঁও কানছে বারে বারে।
তবুও গাঁয়ে নামল না জল, গগনখানা ফাঁকা ;
নিঠুর নীলের বক্ষে আগুন করছে যেনে খাঁ খাঁ ।

উচ্চে ডাকে বাজপক্ষি "আজরাইলে"র ডাক,
"খর দরজাল" আসছে বুঝি শিঙায় দিয়ে হাঁক!
এমন সময় ওই গাঁ হতে বদনা-বিয়ের গানে,
গুটি কয়েক আসলো মেয়ে এই না গাঁয়ের পানে।
আগে পিছে পাঁচটি মেয়ে---পাঁচটি রঙে ফুল,
মাঝের মেয়ে সোনার বরণ, নাই কোথা তার তুল ।
মাথায় তাহার কুলোর উপর বদনা-ভরা জল,
তেল হলুদে কানায় কানায় করছে ছলাৎ ছল ।
মেয়ের দলে বেড়িয়ে তারে চিকন সুরের গানে,
গাঁয়ের পথে যায় যে বলে বদনা-বিয়ের মানে।
ছেলের দলে পড়ল সাড়া, বউরা মিঠে হাসে,
বদনা বিয়ের গান শুনিতে সবাই ছুটে আসে ।
পাঁচটি মেয়ের মাঝের মেয়ে লাজে যে যায় মরি,
বদনা হাতে ছলাৎ ছলাৎ জল যেতে চায় পড়ি।
এ-বাড়ি যায় ও-বাড়ি যায়, গানে মুখর গাঁ,
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে যেন-রাম-শালিকের ছা।

কালো মেঘা নামো নামো, ফুল তোলা মেঘ নামো,
ধূলট মেঘা, তুলট মেঘা, তোমরা সবে ঘামো!
কানা মেঘা, টলমল বারো মেঘার ভাই,
আরও ফুটিক ডলক দিলে চিনার ভাত খাই!

কাজল মেঘা নামো নামো চোখের কাজল দিয়া,
তোমার ভালে টিপ আঁকিব মোদের হলে বিয়া!
আড়িয়া মেঘা, হাড়িয়া মেঘা, কুড়িয়া মেঘার নাতি,
নাকের নোলক বেচিয়া দিব তোমার মাথার ছাতি।
কৌটা ভরা সিঁদুর দিব, সিঁদুর মেঘের গায়,

আজকে যেন দেয়ার ডাকে মাঠ ডুবিয়া যায়!

দেয়ারে তুমি অধরে অধরে নামো।
দেয়ারে তুমি নিষালে নিষালে নামো।
ঘরের লাঙল ঘরে রইল, হাইলা চাষা রইদি মইল ;
দেয়ারে তুমি অরিশাল বদনে ঢলিয়া পড়।
ঘরের গরু ঘরে রইল, ডোলের বেছন ডোলে রইল ;
দেয়ারে তুমি অধরে অধরে নামো।

বারো মেঘের নামে নামে এমনি ডাকি ডাকি,
বাড়ি বাড়ি চলল তারা মাঙন হাঁকি হাঁকি
কেউবা দিল এক পোয়া চাল, কেউবা ছটাকখানি,
কেউ দিল নুন, কেউ দিল ডাল, কেউ বা দিল আনি।
এমনি ভাবে সবার ঘরে মাঙন করি সারা,
রূপাই মিয়ার রুশাই-ঘরের সামনে এল তারা।
রূপাই ছিল ঘর বাঁধিতে, পিছন ফিরে চায়,
পাঁটি মেয়ের রূপ বুঝি ওই একটি মেয়ের গায়!
পাঁচটি মেয়ে, গান যে গায়, গানের মতই লাগে,
একটি মেয়ের সুর ত নয় ও বাঁশী বাজায় আগে।
ওই মেয়েটির গঠন-গাঠন চলন-চালন ভালো,
পাঁচটি মেয়ের রূপ হয়েছে ওরই রূপে আলো।

রূপাইর মা দিলেন এনে সেরেক খানেক ধান,
রূপাই বলে, "এই দিলে মা থাকবে না আর মান।"
ঘর হতে সে এনে দিল সেরেক পাঁচেক চাল,
সেরেক খানেক দিল মেপে সোনা মুগের ডাল।
মাঙন সেরে মেয়ের দল চলল এখন বাড়ি,
মাঝের মেয়ের মাথার ঝোলা লাগছে যেন ভারি।
বোঝার ভারে চলতে নারে, পিছন ফিরে চায় ;
রূপার দুচোখ বিঁধিল গিয়ে সোনার চোখে হায়!

পাঁচ

নক্সী কাঁথার মাঠ - কবি জসীমউদ্দিন

আশ্বিনেতে ঝড় হাঁকিল, বাও ডাকিল জোরে,
গ্রামভরা-ভর ছুটল ঝপট লট্ পটা সব করে।
রূপার বাড়ির রুশাই-ঘরের ছুটল চালের ছানি,
গোয়াল ঘরের খাম থুয়ে তার চাল যে নিল টানি।
ওগাঁর বাঁশ দশটা টাকায়, সে-গাঁয় টাকায় তেরো,
মধ্যে আছে জলীর বিল কিইবা তাহে গেরো।
বাঁশ কাটিতে চলল রূপাই কোঁচায় বেঁধে চিঁড়া,
দুপুর বেলায় খায় যেন সে---মায় দিয়াছে কিরা।
মাজায় গোঁজা রাম-কাটারী চক্ চকাচক্ ধার,
কাঁধে রঙিন গামছাখানি দুলছে যেন হার।
মোল্লা-বাড়ির বাঁশ ভাল, তার ফাঁপগুলি নয় বড় ;
খাঁ-বাড়ির বাঁশ ঢোলা ঢোলা, করছে কড়মড়।
সর্ব্বশেষে পছন্দ হয় খাঁ-বাড়ির বাঁশ :
ফাঁপগুলি তার কাঠের মত, চেকন-চোকন আঁশ।

বাঁশ কাটিতে যেয়ে রূপাই মারল বাঁশে দা,
তল দিয়ে যায় কাদের মেয়ে---হলদে পাখির ছা!
বাঁশ কাটিতে বাঁশের আগায় লাগল বাঁশের বাড়ি,
চাষী মেয়ের দেখে তার প্রাণ বুঝি যায় ছাড়ি।
লম্বা বাঁশের লম্বা যে ফাঁপ, আগায় বসে টিয়া,
চাষীদের ওই সোনার মেয়ে কে করিবে বিয়া!
বাঁশ কাটিতে এসে রূপাই কাটল বুকের চাম,
বাঁশের গায়ে বসে রূপাই ভুলল নিজের কাম।
ওই মেয়ে ত তাদের গ্রামে বদনা-বিয়ের গানে,
নিয়েছিল প্রাণ কেড়ে তার চিকন সুরের দানে।

"খড়ি কুড়াও সোনার মেয়ে! শুকনো গাছের ডাল,
শুকনো আমার প্রাণ নিয়ে যাও, দিও আখার জ্বাল।
শুকনো খড়ি কুড়াও মেয়ে! কোমল হাতে লাগে,
তোমায় যারা পাঠায় বনে বোঝেনি কেন আগে?"
এমনিতর কত কথাই উঠে রূপার মনে,
লজ্জাতে সে হয় যে রঙিন পাছে বা কেউ শোনে।

মেয়েটিও ডাগর চোখে চেয়ে তাহার পানে,
কি কথা সে ভাবল মনে সেই জানে তার মানে!

এমন সময় পিছন হতে তাহার মায়ে ডাকে,
"ওলো সাজু! আয় দেখি তোর নথ বেঁধে দেই নাকে!
ওমা! ও কে বেগান মানুষ বসে বাঁশের ঝাড়ে!"
মাথায় দিয়ে ঘোমটা টানি দেখছে বারে বারে।

খানিক পরে ঘোমটা খুলে হাসিয়া এক গাল,
বলল, "ও কে, রূপাই নাকি? বাঁচবি বহকাল!
আমি যে তোর হইযে খালা, জানিসনে তুই বুঝি?
মোল্লা বাড়ির বড়ুরে তোর মার কাছে নিস্ খুঁজি ।
তোর মা আমার খেলার দোসর---যাকগে ও সব কথা,
এই দুপুরে বাঁশ কাটিয়া খাবি এখন কোথা?"

রূপাই বলে, "মা দিয়েছেন কোঁচায় বেঁধে চিঁড়া"
"ওমা! ও তুই বলিস কিরে? মুখখানা তোর ফিরা!
আমি হেথা থাকতে খালা, তুই থাকবি ভুখে,
শুনলে পরে তোর মা মোরে দুষবে কত রুখে!
ও সাজু, তুই বড় মোরগ ধরগে যেয়ে বাড়ি,
ওই গাঁ হতে আমি এদিক দুধ আনি এক হাঁড়ি।"

চলল সাজু বাড়ির দিকে, মা গেল ওই পাড়া।
বাঁশ কাটতে রূপাই এদিক মারল বাঁশে নাড়া।
বাঁশ কাটিতে রূপার বুকে ফেটে বেরোয় গান,
নলী বাঁশের বাঁশীতে কে মারছে যেন টান!
বেছে বেছে কাটল রূপাই ওড়া-বাঁশের গোড়া,
তল্লা বাঁশের কাটল আগা, কালধোয়ানির জোড়া ;
বাল্ কে কাটে আল্ কে কাটে কঞ্চি কাটে শত,
ওদিক বসে রূপার খালা রান্ধে মনের মত।

সাজু ডাকে তলা থেকে, "রূপা-ভাইগো এসো,"
---এই কথাটি বলতে তাহার লজ্জারো নাই শেষও!

লাজের ভারে হয়তো মেয়ে যেতেই পারে পড়ে,
রূপাই ভাবে হাত দুখানি হঠাৎ যেয়ে ধরে।

যাহোক রূপা বাঁশ কাটিয়া এল খালার বাড়ি,
বসতে তারে দিলেন খালা শীতল পাটি পাড়ি।
বদনা ভরে জল দিল আর খড়ম দিল মেলে,
পাও দুখানি ধুয়ে রূপাই বসল বামে হেলে।
খেতে খেতে রূপাই কেবল খালার তারীফ করে,
"অনেক দিনই এমন ছালুন খাইনি কারো ঘরে।"
খালায় বলে "আমি ত নয়, রেঁধেছে তোর বোনে,"
লাজে সাজুর ইচ্ছা করে লুকায় আঁচল কোণে।
এমনি নানা কথায় রূপার আহার হল সারা,
সন্ধ্যা বেলায় চলল ঘরে মাথায় বাঁশের ভারা।

খালার বাড়ির এত খাওয়া, তবুও তার মুখ,
দেখলে মনে হয় যে সেথা অনেক লেখা দুখ।
ঘরে যখন ফিরল রূপা লাগল তাহার মনে,
কি যেন তার হয়েছে আজ বাঁশ কাটিতে বনে।
মা বলিল, "বাছারে, কেন মলিন মুখে চাও?"
রূপাই কহে, "বাঁশ কাটিতে হারিয়ে এলেম দাও।"

ছয়

ঘরেতে রূপার মন টেকে না যে, তরলা বাঁশীর পারা,
কোন বাতাসেতে ভেসে যেতে চায় হইয়া আপন হারা।
কে যেন তার মনের তরীরে ভাটির করুণ তানে,
ভাটিয়াল সোঁতে ভাসাইয়া নেয় কোন্ সে ভাটার পানে।
সেই চিরকেলে গান আজও গাহে, সুরখানি তার ধরি,
বিগানা গাঁয়ের বিরহিয়া মেয়ে আসে যেন তরি!
আপনার গানে আপনার প্রাণ ছিঁড়িয়া যাইতে চায়,
তবু সেই ব্যথা ভাল লাগে যেন, একই গান পুনঃ গায়।
খেত-খামারেতে মন বসেনাকো ; কাজে কামে নাই ছিরি,

মনের তাহার কি যে হল আজ ভাবে তাই ফিরি ফিরি।
গানের আসরে যায় না রূপাই সাথীরা অবাক মানে,
সারাদিন বসি কি যে ভাবে তার অর্থ সে নিজে জানে!
সময়ের খাওয়া অসময় খায়, উপোসীও কভু থাকে,
"দিন দিন তোর কি হল রূপাই" বার বার মায় ডাকে।
গেলে কোনখানে হয়তো সেথাই কেটে যায় সারা দিন,
বসিলে উঠেনা উঠিলে বসেনা, ভেবে ভেবে তনু ক্ষীণ।
সবে হাটে যায় পথ বরাবর রূপা যায় ঘুরে বাঁকা,
খালার বাড়ির কাছ দিয়ে পথ, বাঁশ-পাতা দিয়ে ঢাকা।

পায়ে-পায় ছাই বাঁশ-পাতাগুলো মচ্ মচ্ করে বাজে ;
কেউ সাথে নেই, তবু যে রূপাই মরে যায় যেন লাজে ।
চোরের মতন পথে যেতে যেতে এদিক ওদিক চায়,
যদিবা হঠাৎ সেই মেয়েটির দুটি চোখে চোখ যায়।
ফিরিবার পথে খালার বাড়ির নিকটে আসিয়া তার,
কত কাজ পড়ে, কি করে রূপাই দেরি না করিয়া আর।
কোনদিন কহে, "খালামা, তোমার জ্বর নাকি হইয়াছে,
ও-বাড়ির ওই কানাই আজিকে বলেছে আমার কাছে।
বাজার হইতে আনিয়াছি তাই আধসেরখানি গজা।"
"বালাই! বালাই! জ্বর হবে কেন? রূপাই, করিলি মজা ;
জ্বর হলে কিরে গজা খায় কেহ?" হেসে কয় তার খালা,
"গজা খায়নাক, যা হোক এখন কিনে ত হইল জ্বালা ;
আচ্ছা না হয় সাজুই খাইবে।" ঠেকে ঠেকে রূপা কহে,
সাজু যে তখন লাজে মরে যায়, মাথা নিচু করে রহে।

কোন দিন কহে, "সাজু কই ওরে, শোনো কিবা মজা, খালা!
আজকের হাটে কুড়ায়ে পেয়েছি দুগাছি পুঁতির মালা ;
এক ছোঁড়া কয়, "রাঙা সূতো" নেবে? লাগিবে না কোন দাম ;
নিলে কিবা ক্ষতি, এই ভেবে আমি হাত পেতে রইলাম।
এখন ভাবছি, এসব লইয়া কিবা হবে মোর কাজ,
ঘরেতে থাকিলে ছোট বোনটি সে ইহাতে করিত সাজ।
সাজু ত আমার বোনেরই মতন, তারেই না দিয়ে যাই,

ঘরে ফিরে যেতে একটু ঘুরিয়া এ-পথে আইনু তাই।"

এমনি করিয়া দিনে দিনে যেতে দুইটি তরুণ হিয়া,
এ উহারে নিল বরণ করিয়া বিনে-সূতী মালা দিয়া।

এর প্রাণ হতে ওর প্রাণে যেয়ে লাগিল কিসের ঢেউ,
বিভোর কুমার, বিভোর কুমারী, তারা বুঝিল না কেউ।
---তারা বুঝিল না, পাড়ার লোকেরা বুঝিল অনেকখানি,
এখানে ওখানে ছেলে বুড়ো মিলে শুরু হল কানাকানি।

সেদিন রূপাই হাট-ফেরা পথে আসিল খালার বাড়ি,
খালা তার আজ কথা কয়নাক, মুখখানি যেন হাঁড়ি।
"রূপা ভাই এলে?" এই বলে সাজু কাছে আসছিল তাই,
মায় কয়, "ওরে ধাড়ী মেয়ে, তোর লজ্জা শরম নাই?"
চুল ধরে তারে গুড়ুম গুড়ুম মারিল দু'তিন কিল,
বুঝিল রূপাই এই পথে কোন হইয়াছে গরমিল।

মাথার বোঝাটি না-নামায়ে রূপা যেতেছিল পথ ধরি,
সাজুর মায়ে যে ডাকিল তাহারে হাতের ইশারা করি ;
"শোন বাছা কই, লোকের মুখেতে এমন তেমন শুনি,
ঘরে আছে মোর বাড়ন্ত মেয়ে জ্বলন্ত এ আগুনি।
তুমি বাপু আর এ-বাড়ি এসো না।" খালা বলে রোষে রোষে,
"কে কি বলে? তার ঘাড় ভেঙে দেব!" রূপা কহে দম কসে।
"ও-সবে আমার কাজ নাই বাপু, সোজা কথা ভালবাসি,
সারা গাঁয়ে আজ ঢি ঢি পড়ে গেছে, মেয়ে হল কুল-নাশী।"

সাজুর মায়ের কথাগুলি যেন বঁরশীর মত বাঁকা,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মনে দিয়ে যায় তীব্র বিষের ধাকা।
কে যেন বাঁশের জোড়-কঞ্চিতে তাহার কোমল পিঠে,
মহারোষ-ভরে সপাং সপাং বাড়ি দিল গিঠে গিঠে।
টলিতে টলিতে চলিল রূপাই একা গাঁর পথ ধরি,
সম্মুখ হতে জোনাকীর আলো দুই পাশে যায় সরি।

নক্সী কাঁথার মাঠ - কবি জসীমউদ্দিন

রাতের আঁধারে গালি-ভরা বিষে জমাট বেঁধেছে বুঝি,
দুই হাতে তাহা ঠেলিয়া ঠেলিয়া চলে রূপা পথ খুঁজি ।
মাথার ধামায় এখনও রয়েছে দুজোড়া রেশমী চুরী,
দুপায়ে তাহারে দলিয়া রূপাই ভাঙিয়া করিল গুঁড়ি।
টের সদাই জলীর বিলেতে দুহাতে ছুঁড়িয়া ফেলি,
পথ থুয়ে রূপা বেপথে চলিল, ইটা খেতে পাও মেলি।
চলিয়া চলিয়া মধ্য মাঠেতে বসিয়া কাঁদিল কত,
অষ্টমী চাঁদ হেলিয়া হেলিয়া ওপারে হইল গত।

প্রভাতে রূপাই উঠিল যখন মায়ের বিছানা হতে,
চেহারা তাহার আধা হয়ে গেছে, চেনা যায় কোন মতে।
মা বলে, "রূপাই কি হলরে তোর?" রূপাই কহে না কথা
দুখিনী মায়ের পরাণে আজিকে উঠিল দ্বিগুণ ব্যথা।
সাত নয় মার পাঁচ নয় এক রুপাই নয়ন তারা,
এমনি তাহার দশা দেখে মায় ভাবিয়া হইল সারা।
শানাল পীরের সিন্নি মানিল খেতে দিল পড়া-পানি,
হেদের দৈন্য দেখিল জননী, দেখিলনা প্রাণখানি।
সারা গায়ে মাতা হাত বুলাইল চোখে মুখে দিল জল,
বুঝিল না মাতা বুকের ব্যথার বাড়ে যে ইহাতে বল ।

আজকে রূপার সকলি আঁধার, বাড়া-ভাতে ওড়ে ছাই,
কলঙ্ক কথা সবে জানিয়াছে, কেহ বুঝি বাকি নাই।
জেনেছে আকাশ, জেনেছে বাতাস, জেনেছে বনের তরু ;
উদাস-দৃষ্টি য়ত দিকে চাহে সব যেন শূনো মরু ।

চারিদিক হতে উঠিতেছে সুর, ধিক্কার! ধিক্কার!!
শাঁখের করাত কাটিতেছে তারে লয়ে কলঙ্ক ধার।
ব্যথায় ব্যথায় দিন কেটে গেল, আসিল ব্যথার সাঁজ,
পূবে কলঙ্কী কালো রাত এল, চরণে ঝিঁঝির ঝাঁজ!
অনেক সুখের দুখের সাক্ষী বাঁশের বাঁশীটি নিয়ে,
বসিল রূপাই বাড়ির সামনে মধ্য মাঠেতে গিয়ে।

মাঠের রাখাল, বেদনা তাহার আমরা কি অত বুঝি ;
মিছেই মোদের সুখ-দুখ দিয়ে তার সুখ-দুখ খুঁজি।
আমাদের ব্যথা কেতাবেতে লেখা, পড়িলেই বোঝা যায় ;
যে লেখে বেদনা বে-বুঝ বাঁশীতে কেমন দেখাব তায়?
অনন্তকাল যাদের বেদনা রহিয়াছে শুধু বুকে,
এ দেশের কবি রাখে নাই যাহা মুখের ভাষায় টুকে ;
সে ব্যথাকে আমি কেমনে জানাব? তবুও মাটিতে কান ;
পেতে রহি কভু শোনা যায় কি কহে মাটির প্রাণ!
মোরা জানি খোঁজ বৃন্দাবনেতে ভগবান করে খেলা,
রাজা-বাদশার সুখ-দুখ দিয়ে গড়েছি কথার মালা।
পল্লীর কোলে নির্ব্বাসিত এ ভাইবোনগুলো হায়,
যাহাদের কথা আধ বোঝা যায়, আধ নাহি বোঝা যায় ;
তাহাদেরই এক বিরহিয়া বুকে কি ব্যথা দিতেছে দোল,
কি করিয়া আ দেখাইব তাহা, কোথা পাব সেই বোল?
---সে বন-বিহগ কাঁদিতে জানে না, বেদনার ভাষা নাই,
ব্যাধের শায়ক বুকে বিঁধিয়াছে জানে তার বেদনাই ।

বাজায় রূপাই বাঁশীটি বাজায় মনের মতন করে,
যে ব্যথা সে বুকে ধরিতে পারেনি সে ব্যথা বাঁশীতে ঝরে ।
বাজে বাঁশী বাজে, তারি সাথে সাথে দুলিছে সাঁজের আলো ;
নাচে তালে তালে জোনাকীর হারে কালো মেঘে রাত-কালো।
বাজাইল বাঁশী ভাটিয়ালী সুরে বাজাল উদাস সুরে,
সুর হতে সুর ব্যথা তার চলে যায় কোন দূরে!
আপনার ভাবে বিভোল পরাণ, অনন্ত মেঘ-লোকে,
বাঁশী হতে সুরে ভেসে যায় যেন, দেখে রূপা দুই চোখে।
সেই সুর বয়ে চলেছে তরুণী, আউলা মাথার চুল,
শিথিল দুখান বাহু বাড়াইয়াছিঁড়িছে মালার ফুল ।
রাঙা ভাল হতে যতই মুছিছে ততই সিঁদুর জ্বলে ;
কখনও সে মেয়ে আগে আগে চলে, কখনও বা পাছে চলে।
খানিক চলিয়া থামিল করুণী আঁচলে ঢাকিয়া চোখ,
মুছিতে মুছিতে মুছিতে পারে না, কি যেন অসহ শোক!

করুণ তাহার করুণ কান্না আকাশ ছাইয়া যায়,
কি যে মোহের রঙ ভাসে মেঘে তাহার বেদনা-ঘায়।
পুনরায় যেন খিল খিল করে একগাল হাসি হাসে,
তারি ঢেউ লাগি গগনে গগনে তড়িতের রেখা ভাসে।

কখনও আকাশ ভীষণ আঁধার, সব গ্রাসিয়াছে রাহু,
মহাশূণ্যের মাঝে ভেসে উঠে যেন দুইখানি বাহু!
দোলে-দোলে-বাহু তারি সাথে যেন দোলে-দোলে কত কথা,
"ঘরে ফিরে যাও, মোর তরে তুমি সহিও না আর ব্যথা।"
মুহূর্ত পরে সেই বাহু যেন শূণ্যে মিলায় হায়---
রামধনু বেয়ে কে আসে ও মেয়ে, দেখে যেন চেনা যায়!
হাসি হাসি মুখ গলিয়া গলিয়া হাসি যায় যেন পড়ে,
সার গায়ে তার রূপ ধরেনাক, পড়িছে আঁচল ঝরে।
কণ্ঠে তাহার মালার গন্ধে বাতাস পাগল পারা,
পায়ে রিনি ঝিনি সোনার নূপুর বাজিয়া হইছে সারা ;

হঠাৎ কে এল ভীষণ দস্যু---ধরি তার চুল মুঠি,
কোন্ আন্ধার গ্রহপথ বেয়ে শূণ্যে সে গেল উঠি।
বাঁশী ফেলে দিয়ে ডাক ছেড়ে রূপা আকাশের পানে চায়,
আধা চাঁদখানি পড়িছে হেলিয়া সাজুদের ওই গাঁয়।
শুনো মাঠে রূপা গড়াগড়ি যায়, সারা গায়ে ধূলো মাখে,
দেহেরে ঢাকিছে ধূলো মাটি দিয়ে, ব্যথারে কি দিয়ে ঢাকে!

সাত

কান্-কানা-কান্ ছুটল কথা গুন্-গুনা-গুন তানে,
শোন্-শোনা-শোন সবাই শোনে, কিন্তু কানে কানে।
"কি করগো রূপার মাতা? খাইছ কানের মাথা?
ও-দিক যে তোর রূপার নামে রটছে গাঁয়ে যা তা!
আমরা বলি রূপাই এমন সোনার কলি ছেলে,
তার নামে হয় এমন কথা দেখব কি কাল গেলে?"
এই বলিয়া বড়াই বুড়ি বসল বেড়ি দোর,

রূপার মা কয়, "বুঝিনে বোন কি তোর কথার ঘোর!"
বুড়ি যেন আচমকা হায় আকাশ হতে পড়ে,
"সবাই জানে তুই না জানিস যে কথা তোর ঘরে?"
ও-পাড়ার ও ডাগর ছুঁড়ী, সেখের বাড়ির "সাজু"
তারে নাকি তোর ছেলে সে গড়িয়ে দেছে বাজু।
ঢাকাই শাড়ী কিন্যা দিছে, হাঁসলী দিছে নাকি,
এত করে এখন কেন শাদীর রাখিস বাকি?"
রূপার মা কয়, "রূপা আমার এক-রত্তি ছেলে,
আজও তাহার মুখ শুঁকিলে দুধের ঘিরাণ মেলে।
তার নামে যে এমন কথা রটায় গাঁয়ে গাঁয়ে,
সে যেন তার বেটার মাথা চিবায় বাড়ি যায়।"

রূপার মায়ের রুঠা কথায় উঠল বুড়ীর কাশ,
একটু দিলে তামাক পাতা, নিলেন বুড়ী শ্বাস।
এমন সময় ওই গাঁ হতে আসল খেঁদির মাতা,
টুনির ফুপু আসল হাতে ডলতে তামাক পাতা।
ক'জনকে আর থামিয়ে রাখে? বুঝল রূপার মা ;
রূপা তাহার সত্যি করেই এতটুকুন না।
বুঝল মায়ে কেন ছেলে এমন উদাস পারা,
হেথায় হোথায় কেবল ঘোরে হয়ে আপন হারা।
ও পাড়ার ও দুখাই মিয়া ঘটকালিতে পাকা,
সাজুর সাথেই জুড়ুর বিয়ে যতকে লাগুক টাকা।

শেখ বাড়িতে যেয়ে ঘটক বেকী-বেড়ার কাছে,
দাঁড়িয়ে বলে, "সাজুর মাগো, একটু কথা আছে।"
সাজুর মায়ে বসতে তারে এনে দিলেন পিঁড়ে,
ডাব্বা হুঁকা লাগিয়ে বলে, "আস্তে টান ধীরে।"
ঘটক বলে, "সাজুর মাগো মেয়ে তোমার বড়,
বিয়ের বয়স হল এখন ভাবনা কিছু কর।"
সাজুর মা কয় "তোমরা আছ ময়-মুরুব্বি ভাই,
মেয়ে মানুষ অত শত বুঝি কি আর ছাই!
তোমরা যা কও ঠেলতে কি আর সাধ্য আছে মোর?"

ঘটক বলে, "এই ত কথা, লাগবে না আর ঘোর।
ও-পাড়ার ও রূপারে ত চেনই তুমি বোন্,
তার সাথে দাও মেয়ের বিয়ে ঠিক করিয়ে মন।"
সাজুর মা কয়, "জান ত ভাই! রটছে গাঁয়ে যাতা,
রূপার সাথে বিয়ে দিলে থাকবে না আর মাথা।"

ঘটক বলে, "কাঁটা দিয়েই তুলতে হবে কাঁটা,
নিন্দা যারা করে তাদের পড়বে মুখে ঝাঁটা।
রূপা ত আর নয় এ গাঁয়ে যেমন তেমন ছেলে,
লক্ষ্মীরে দেই বউ বানায়ে অমন জামাই পেলে!"
ঠাটে ঘটক কয় গো কথা ঠোঁট-ভরাভর হাসে ;
সাজুর মায়ের পরাণ তারি জোয়ার-জলে ভাসে।
"দশ খান্দা জমি রূপার, তিনটি গরু হালে,
ধানের-বেড়ী ঠেকে তাহার বড় ঘরের চালে।"
সাজু তোমার মেয়ে যেমন, রূপাও ছেলে তেমন,
সাত গেরামের ঘটক আমি জোড় দেখিনি এমন।"

তার পরেতে পাড়ল ঘটক রূপার কুলের কথা,
রূপার দাদার নাম গুনে লোক কাঁপত যথা তথা।
রূপার নানা সোয়েদ-ঘেঁষা, মিঞাই বলা যায়---
কাজী বাড়ির প্যায়দা ছিল কাজল-তলার গাঁয়।
রূপার বাপের রাখত খাতির গাঁয়ের চৌকিদারে,
আসেন বসেন মুখের কথা---গান বজিত তারে।
রূপার চাচা অছিমদ্দী, নাম শোন নি তার?
ইংরেজী তার বোল শুনিলে সব মানিত হার।
কথা ঘটক বলল এঁটে, বলল কখন ঢিলে,
সাজুর মায়ে সবগুলি তার ফেলল যেন গিলে।

মুখ দেখে বুঝল ঘটক---লাগছে অষুধ হাড়ে,
বলল, "তোমার সাজুর বিয়া ঠিক কর এই বারে।"
সাজুর মা কয়, " যা বোঝ ভাই, তোমরা গ্যা তাই কর,
দেখ যেন কথার আবার হয় না নড়চড়।"

"আউ ছি ছি!" ঘটক বলে, "শোনই কথা বোন,
তোমার সাজুর বিয়া দিতে লাগবে কত পণ?
পোণে দিব কুড়ি দেড়েক বায়না দেব তেরো,
চিনি সন্দেশ আগোড়-বাগোড় এই গে ধর বারো।
সবদ্যা হল দুই কুড়ি এ নিতেই হবে বোন,
চাইলে বেশী জামাইর তোমার বেজার হবে মন!"
সাজুর মা কয়, "ও-সব কথার কি-ইবা আমি জানি,
তোমরা যা কও তাইত খোদার গুকুর বলে মানি ।"
সাধে বলে দুখাই ঘটক ঘটকালিতে পাকা,
আদ্য মধ্য বিয়ের কথা সব করিল ফাঁকা।

চল্-চলা-চল্ চলল দুখাই পথ বরাবর ধরি,
তাগ্-ধিনা-ধিন্ নাচে যেন গুন্ গুনা গান করি।
দুখাই ঘটক নেচে চলে নাচে তাহার দাড়ি,
বুড়োর বটের শিকড় যেন চলছে নাড়ি নাড়ি ;
লম্ফে লম্ফে চলে ঘটক দম্ভ করে চায়,
লুটের মহল দখল করে চলছে যেন গাঁয়!
ঘটকালিরই টাকা যেন ঝন্-ঝনা-ঝন্ বাজে,
হন্-হানা-হন্ চলল ঘটক একলা পথের মাঝে।
ধানের জমি বাঁয় ফেলিয়া ফেলিয়া, ডাইনে ঘন পাট,
জলীর বিলে নাও বাঁধিয়া ধরল গাঁয়ের বাট।
"কি কর গো রূপার মাতা, ভবছ বসি কিবা,
সাজুর সাথেই ঠিক কইরাছি তোমার ছেলের বিবা ।
সহজে কি হয় সে রাজি, একশ টাকা পণ,
এর কমেতে বসেইনাক সাজুর মায়ের মন ।

আমিও আবার কুড়ি তিনেক উঠিনে তার পরে,
সাজুর মায়ও নাছোড়-বান্দা, দিলাম তখন ধরে ;
আরেক কুড়ি, তয় সে কথা কইল হাসি হাসি,
আমি ভাবি, বিয়ার বুঝি বাজল সানাই বাঁশী ।
এখন বলি রূপার মাতা, আড়াই কুড়ি টাকা,

মোর কাছেতে দিবা, কথা হয় না যেন ফাঁকা!
আসব দিয়ে গোপনে তায়, নইলে গাঁয়ের লোকে,
মেজবানী দাও বলে তারে ধরবে চীনে জোঁকে।
বিয়ের দিনে নিবে সে তাই তিরিশ টাকা যেচে,
যারে তারে বলতে পার এই কথাটি নেচে।
চিনি সন্দেশ আগোড়-বাগোড় তার লাগিবে ষোলো,
এই ধরগ্যা রূপার বিয়া আজই যেন হল।"

রূপার মায়ের আহ্লাদে প্রাণ ধরেইনাক আর,
ইচ্ছে করে নেচে নেচে বেড়ায় বারে বার।
"ও রূপা তুই কোথায় গেলি? ভাবিসনাক মোটে,
কপাল গুণি বিয়ে যে তোর সাজুর সাথেই জোটে!"
এই বলিয়া রূপার মাতা ছুটল গাঁয়ের পানে,
ঘটক গেল নিজের বাড়ি গুন্-গুনা-গুন্ গানে।

আট

বিয়ের কুটুম এসেছে আজ সাজুর মায়ের বাড়ি,
কাছারী ঘর গুম্-গুমা-গুম্ , লোক হয়েছে ভারি।
গোয়াল-ঘরে ঝেড়ে পুছে বিছান দিল পাতি ;
বসল গাঁয়ের মোল্লা মোড়ল গল্প-গানে মাতি।
কেতাব পড়ার উঠল তুফান ; ---চম্পা কালু গাজী,
মামুদ হানিফ সোনবান ও জয়গুন বিবি আজি ;
সবাই মিলে ফিরছে যেন হাত ধরাধর করি।
কেতাব পড়ার সুরে সুরে চরণ ধরি ধরি।
পড়ে কেতাব গাঁয়ের মোড়ল নাচিয়ে ঘন দাড়ি,
পড়ে কেতাব গাঁয়ের মোল্লা মাঠ-ফাটা ডাক ছাড়ি।

কৌতুহলী গাঁয়ের লোকে শুনছে পেতে কান,
জুমজুমেরি পানি যেন করছে তারা পান!
দেখছে কখন মনের সুখে মামুদ হানিফ যায়,
লাল ঘোড়া তার উড়ছে যেন লাল পাখিটির প্রায়।

কাতার কাতার সৈন্য কাটে যেমন কলার বাগ,
মেষের পালে পড়ছে যেন সুন্দর-বুনো বাঘ !
স্বপ্ন দেখে, জয়গুন বিবি পালঙ্কেতে শুয়ে ;
মেঘের বরণ চুলগুলি তার পড়ছে এসে ভূঁয়ে ;
আকাশেরি চাঁদ সূরুজে মুখ দেখে পায় লাজ,
সেই কনেরে চোখের কাছে দেখছে চাষী আজ।
দেখছে চোখে কারবালাতে ইমাম হোসেন মরে,
রক্ত যাহার জমছে আজো সন্ধ্যা মেঘের গোরে ;
কারবালারি ময়দানে সে ব্যথার উপাখ্যান ;
সারা গাঁয়ের চোখের জলে করিয়া গেল সান।

উঠান পরে হল্লা-করে পাড়ার ছেলে মেয়ে,
রঙিন বসন উড়ছে তাদের নধর তনু ছেয়ে।
কানা-ঘুষা করত যারা রূপার স্বভাব নিয়ে,
ঘোর কলিকাল দেখে যাদের কানত সদা হিয়ে ;
তারাই এখন বিয়ের কাজে ফিরছে সবার আগে,
ভাভা গড়ার সকল কাজেই তাদের সমান লাগে।
বউ-ঝিরা সব রান্না-বাড়ায় ব্যস্ত সকল ক্ষণ ;
সারা বাড়ি আনন্দ আজ খুশী সবার মন।
বাহিরে আজ এই যে আমোদ দেখছে জনে জনে ;
ইহার চেয়ে দ্বিগুণ আমোদ উঠছে রূপার মনে।
ফুল পাগড়ী মাথায় তাহার "জোড়া জামা" গায়,
তেল-কুচ্-কাচ্ কালো রঙে ঝলক্ দিয়ে যায়।

বউ-ঝিরা সব ঘরের বেড়ার খানিক করে ফাঁক,
নতুন দুলার রূপ দেখি আজ চক্ষে মারে তাক।
এমন সময় শোর উঠিল--- "বিয়ের যোগাড় কর,
জলদী করে দুলার মুখে পান শরবত ধর।"
সাজুর মামা খটকা লাগায়, "বিয়ের কিছু গৌণ,
সাদার পাতা আনেনি তাই বেজার সবার মন।"
রূপার মামা লম্ফে দাঁড়ায় দম্ভে চলে বাড়ি ;
সেরেক পাঁচেক সাদার পাতা আনল তাড়াতাড়ি।

কনের খালু উঠিয়া বলে "সিঁদুর হল ঊনা!"
রূপার খালু আনিয়া দিল যা লাগে তার দুনা!

কনের চাচার মন উঠে না, "খাটো হয়েছে শাড়ী।"
রূপার চাচা দিল তখন "ইংরাজী বোল ছাড়ি"।
"কিরে বেটা বকিস নাকি?" কনের চাচা হাঁকে,
জালির কলার পাতার মত গা কাঁপে তার রাগে।
"কোথায় গেলি ছদন চাচা, ছমির শেখের নাতি,
দেখিয়ে দেই দুলার চাচার কতই বুকের ছাতি!
বেরো বেটা নওশা নিয়ে, দিব না আজ বিয়া ;"
বলতে যেন আগুন ছোটে চোখ দুটি তার দিয়া।

বরপক্ষের লোকগুলি সব আর যে বরের চাচা,
পালিয়ে যেতে খুঁজছে যেন রশুই ঘরের মাচা।

মোড়ল এসে কনের চাচায় অনেক করে বলে,
থামিয়ে তারে বিয়ের কথা পাতেন কুতূহলে।
কনের চাচা বসল বরের চাচার কাছে,
কে বলে ঝড় এদের মাঝে হয়েছে যে পাছে!
মোল্লা তখন কলমা পড়ায় সাক্ষী-উকিল ডাকি,
বিয়ে রূপার হয়ে গেল, ক্ষীর-ভোজনী বাকি!

তার মাঝেতে এমন তেমন হয়নি কিছু গোল,
কেবল একটি বিষয় নিয়ে উঠল হাসির রোল।
এয়োরা সব ক্ষীর ছোঁয়ায়ে কনের ঠোঁটের কাছে ;
সে ক্ষীর আবার ধরল যখন রূপার ঠোঁটের পাছে ;
রূপা তখন ফেলল খেয়ে ঠোঁট ছোঁয়া সেই ক্ষীর,
হাসির তুফান উঠল নেড়ে মেয়ের দলের ভীড়।
ভাবল রূপাই---অমন ঠোঁটে যে ক্ষীর গেছে ছুঁয়ে,
দোজখ যাবে না খেয়ে তা ফেলবে যে জন ভূঁয়ে।

আষাঢ় মাসে রূপীর মায়ে মরল বিকার জ্বরে,
রূপা সাজু খায়নি খানা সাত আট দিন ধরে।
লালন পালন যে করিত "ঠোঁটের" আধার দিয়া,
সেই মা আজি মরে রূপার ভাঙল সুখের হিয়া।
ঘামলে পরে যে তাহারে করত আবের পাখা ;
সেই শাশুড়ী মরে, সাজুর সব হইল ফাঁকা।
সাজু রূপা দুই জনেতে কান্দে গলাগলি ;
গাছের পাতা যায় যে ঝরে, ফুলের ভাঙে কলি।
এত দুখের দিনও তাদের আস্তে হল গত,
আবার তারা সুখেরি ঘর বাঁধল মনের মত।

দশ

নতুন চাষা ও নতুন চাষাণী পাতিল নতুন ঘর,
বাবুই পাখিরা নীড় বাঁধে যথা তালের গাছের পর।
মাঠের কাজেতে ব্যস্ত রূপাই, নয়া বউ গেহ কাজে,
দুইখান হতে দুটি সুর যেন এ উহারে ডেকে বাজে।
ঘর চেয়ে থাকে কেন মাঠ পানে, মাঠ কেন ঘর পানে,
দুইখানে রহি দুইজন আজি বুঝিছে ইহার মানে।

আশ্বিন গেল, কার্তিক মাসে পাকিল খেতের ধান,
সারা মাঠ ভরি গাহিতেছে কে যেন হল্ দি-কোটার গান।
ধানে ধান লাগি বাজিছে বাজনা, গন্ধ উড়িছে বায়,
কলমীলতায় দোলন লেগেছে, হেসে কূল নাহি পায়।
আজো এই গাঁও অঝোরে চাহিয়া ওই গাঁওটির পানে,
মাঝে মাঠখানি চাদর বিছায়ে হলুদ বরণ ধানে।

আজকে রূপার বড় কাজ---কাজ---কোন অবসর নাই,
মাঠে যেই ধান ধরেনাক আজি ঘরে দেবে তারে ঠাঁই।
সারা মাঠে ধান, পথে ঘাটে ধান উঠানেতে ছড়াছড়ি,
সারা গাঁও ভরি চলেছে কে কবি ধানের কাব্য পড়ি।

আজকে রূপার মনে পড়েনাক শাপলার লতা দিয়ে,

নয়া গৃহিনীর খোঁপা বেঁধে দিত চুলগুলি তার নিয়ে ।
সিঁদুর লইয়া মান হয়নাক বাজে না বাঁশের বাঁশী,
শুধু কাজ---কাজ, কি যাদু-মন্ত্র ধানেরা পড়িছে আসি।

সারাটি বরষা কে কবি বসিয়া বেঁধেছে ধানের গান,
কত সুদীর্ঘ দিবস রজনী করিয়া সে অবসান ।
আজকে তাহার মাঠের কাব্য হইয়াছে বুঝি সারা,
ছুটে গেঁয়ো পাখি ফিঙে বুলবুল তারি গানে হয়ে হারা ।

কৃষাণীর গায়ে গহনা পরায় নতুন ধানের কুটো ;
এত কাজ তবু হাসি ধরেনাক, মুখে ফুল ফুটো ফুটো!
আজকে তাহার পাড়া-বেড়ানর অবসর মোটে নাই,
পার খাড়ুগাছি কোথা পড়ে আছে, কেবা খোঁজ রাখে ছাই!

অর্ধেক রাত উঠোনেতে হয় ধানের মলন মলা,
বনের পশুরা মানুষের কাজে মিশায় গলায় গলা ।
দাবায় শুইয়া কৃষাণ ঘুমায়, কৃষাণীর কাজ ভারি,
ঢেকির পারেতে মুখর করিছে একেলা সারাটি বাড়ি ।
কোন দিন চাষী শুইয়া শুইয়া গাহে বিরহের গান,
কৃষাণের নারী ঘুমাইয়া পড়ে, ঝাড়িতে ঝাড়িতে ধান।
হেমন্ত চাঁদ অর্ধেক হেলি জ্যোৎস্নার জাল পাতি,
টেনে টেনে তারে হয়রান হয়ে ডুবে যায় রাতারাতি ।

এমনি করিয়া ধানের কাব্য হইয়া আসিল সারা,
গানের কাব্য আরম্ভ হল সারাটা কৃষাণ পাড়া!
রাতেরে উহারা মানিবে না যেন, নতুন গলার গানে,
বাঁশী বাজাইয়া আজকে রাতের করিবে নতুন মানে ।

আজিকে রূপার কোন কাজ নাই, ঘুম হতে যেন জাগি,
শিয়রে দেখিছে রাজার কুমারী তাহারই ব্যথার ভাগী ।

সাজুও দেখিছে কোথাকার যেন রাজার কুমার আজি,
ঘুম হতে তারে সবে জাগায়েছে অরুণ-আলোয় সাজি।

নতুন করিয়া আজকে উহারা চাহিছে এ ওর পানে,
দীর্ঘ কাজের অবসর যেন কহিছে নতুন মানে!
নতুন চাষার নতুন চাষাণী নতুন বেঁধেছে ঘর,
সোহাগে আদরে দুটি প্রাণ যেন করিতেছে নড়নড়!
বাঁশের বাঁশীতে ঘুণ ধরেছিল, এতদিন পরে আজ,
তেলে জলে আর আদরে তাহার হইল নতুন সাজ।
সন্ধ্যার পরে দাবায় বসিয়া রূপাই বাজায় বাঁশী,
মহাশূণ্যের পথে সে ভাসায় শূণ্যের সুররাশি!
ক্রমে রাত বাড়ে, বউ বসে দূরে, দুটি চোখ ঘুমে ভার,
"পায়ে পড়ি ওগো চলো শুতে যাই, ভাল লাগে নাক আর।"
রূপা ত সে কথা শোনেই নি যেন, বাঁশী বাজে সুরে সুরে,
"ঘরে দেখে যারে সেই যেন আজি ফেরে ওই দূরে দূরে।"
বউ রাগ করে, "দেখ, বলে রাখি, ভাল হবেনাক পরে,
কালকের মত কর যদি তবে দেখিও মজাটি করে।
ওমনি করিয়া সারারাত আজি বাজাইবে যদি বাঁশী,
সিঁদুর আজিকে পরিব না ভালে, কাজল হইবে বাসি।
দেখ, কথা শোন, নইলে এখনি খুলিব কানের দুল,
আজকে ত আমি খোঁপা বাঁধিব না, আলগা রহিবে চুল।"
বেচারী রূপাই বাঁশী বাজাইতে এমনি অত্যাচার,
কৃষাণের ছেলে! অত কিবা বোঝে, তখনই মানিল হার।

কহে জোড় করে, "শোন গো হুজুর, অধম বাঁশীর প্রতি,
মৌন থাকার কঠোর দণ্ড অন্যায় এ যে অতি।
আজকে ও-ভালে সিঁদুর দিবে না, খুলিবে কানের দুল,
সন্ধ্যে হবে না সিঁদুরে রঙের---ভোরে হাসিবে না ফুল!
এক বড় কথা! আচ্ছা দেখাই, ওরে ও অধম বাঁশী,
এই তরুণীর অধরের গানে তোমার হইবে ফাঁসী!"
হাতে লয়ে বাঁশী বাজাইল রূপা মাঠের চিকন সুরে,
কভু দোলাইয়া বউটির ঠোঁটে কভু তারে ঘুরে ঘুরে।
বউটি যেন গো হেসে হয়রান, কহে ঠোঁটে ঠোঁট চাপি,
"বাঁশীর দণ্ড হইল, কিন্তু যে বাজাল সে পাপী?"

পুনঃ জোর করে রূপা কহে, "এই অধমের অপরাধ,
ভয়ানক যদি, দণ্ড তাহার কিছু কম নিতে সাধ!"
রূপার বলার এমনি ভঙ্গী বউ হেসে কুটি কুটি,
কখনও পড়িছে মাটিতে ঢলিয়া, কভু গায়ে পড়ে লুটি।
পরে কহে, "দেখো, আরও কাছে এসো, বাঁশীটি লও তো হাতে,
এমনি করিয়া দোলাও ত দেখি নোলক দোলার সাথে!"

বাঁশী বাজে আর নোলক যে দোলে, বউ কহে আর বার,
"আচ্ছা আমার বাহুটি নাকিগো সোনালী লতার হার?
এই ঘুরালেম, বাজাও ত দেখি এরি মত কোন সুর,"
তেমনি বাহুর পরশের মত বাজে বাঁশী সুমধুর!
দুটি করে রাঙা ঠোঁটখানি টেনে কহে বউ, "এরি মত,
তোমার বাঁশীতে সুর যদি থাকে বাজাইলে বেশ হত।"
চলে মেঠো বাঁশী দুটি ঠোঁট ছুঁয়ে কলমী ফুলের বুকে,
ছোট চুমু রাখি চলে যেন বাঁশী, চলে সে যে কোন লোকে।

এমনি করিয়া রাত কেটে যায় ; হাসে রবি ধীরি ধীরি,
বেড়ার ফাঁকেতে উঁকি মেরে দেখি দুটি খেয়ালীর ছিরি।
সেদিন রাত্রে বাঁশী শুনে শুনে বউটি ঘুমায়ে পড়ে,
তারি রাঙা মুখে বাঁশী-সুরে রূপা বাঁকা চাঁদ এনে ধরে।
তারপরে খুলে চুলের বেণীটি বার বার করে দেখে,
বাহুখানি দেখে নাড়িয়া নাড়িয়া বুকের কাছেতে রেখে।
কুসুম-ফুলেতে রাঙা পাও দুটি দেখে আরো রাঙা করি,
মৃদু তালে তালে নিঃশ্বাস লয়, শুনে মুখে মুখ ধরি।
ভাবে রূপা, ও-যে দেহ ভরি যেন এনেছে ভোরের ফুল,
রোদ উঠিলেই শুকাইয়া যাবে, শুধু নিমিষের ভুল!
হায় রূপা, তুই চোখের কাজলে আঁকিলি মোহন ছবি,
এতটুকু ব্যথা না লাগিতে যেরে ধুয়ে যাবে তোর সবি!

ওই বাহু আর ওই তনু-লতা ভাসিছে সোঁতের ফুল,
সোঁতে সোঁতে ও যে ভাসিয়া যাইবে ভাঙিয়া রূপার কূল!
বাঁশী লয়ে রূপা বাজাতে বসিল বড় ব্যথা তার মনে,

উদাসীয়া সুর মাথা কুটে মরে তাহার ব্যথার সনে ।

ধারায় ধারায় জল ছুটে যায় রূপার দুচোখ বেয়ে,
বইটি তখন জাগিয়া উঠিল তাহার পরশ পেয়ে।
"ওমা ওকি? তুমি এখনো শোওনি! খোলা কেন মোর চুল?
একি! দুই পায়ে কে দেছে ঘষিয়া রঙিন কুসুম ফুল?
ওকি! ওকি!! তুমি কাঁদছিলে বুঝি! কেন কাঁদছিলে বল?"
বলিতে বলিতে বউটির চোখ জলে করে ছল ছল!
বাহুখানা তার কাঁধ পরে রাখি রূপা কয় মৃদু সুরে,
"শোন শোন সই, কে যেন তোমায় নিয়ে যেতে চায় দূরে!"

"সে দূর কোথায়?" "অনেক---অনেক---দেশ যেতে হয় ছেড়ে,
সেথা কেউ নাই শুধু আমি তুমি আর সেই সে অচেনা ফেরে।
তুমি ঘুমাইলে সে এসে আমায় কয়ে যায় কানে কানে,
যাই---যাই---ওরে নিয়ে যাই আমি আমার দেশের পানে।
বল, তুমি সেথা কখনও যাবে না, সত্যি করিয়া বল!"
"নয়! নয়! নয়!" বউ কহে তার চোখ দুটি ছল ছল।

রূপা কয় "শোন সোনার বরণি, আমার এ কুঁড়ে ঘর,
তোমার রূপের উপহাস শুধু করে সারা দিনভর ।
তুমি ফুল! তব ফুলের গায়েতে বহে বিহানের বায়ু,
আমি কাঁদি সই রোদ উঠিলে যে ফুরাবে রঙের আয়ু ।
আহা আহা সখি, তুমি যাহা কর, মোর মনে লয় তাই,
তোমার ফুলের পরাণে কেবল দিয়া যায় বেদনাই ।"
এমন সময় বাহির হইতে বছির মামুর ডাকে,
ধড়মড় করি উঠিয়া রূপাই চাহিল বেড়ার ফাঁকে।

এগার

"ও রূপা তুই করিস কিরে? এখনো তুই রইলি শুয়ে?
বন-গেঁয়োরা ধান কেটে নেয় গাজনা-চরের খামার ভূঁয়ে।"
"কি বলিলা বছির মামু ?" উঠল রূপাই হাঁক ছাড়িয়া,

আগুনভরা দুচোখ হতে গোল্লা-বারুদ যায় উড়িয়া।
পাটার মত বুকখানিতে থাপড় মারে শাবল হাতে,
বুকের হাড়ে লাগল বাড়ি, আগুন বুঝি জ্বলবে তাতে!
লম্ফে রূপা আনলো পেড়ে চাং হতে তার সড়কি খানা,
ঢাল ঝুলায়ে মাজার সাথে থালে থালে মারল হানা ।
কোথায় রল রহম চাচা, কলম শেখ আর ছমির মিঞা,
সাউদ পাড়ার খাঁরা কোথায়? কাজীর পোরে আন ডাকিয়া!
বন-গেঁয়োরা ধান কেটে নেয় থাকতে মোরা গফর-গাঁয়ে,
এই কথা আজ শোনার আগে মরিনি ক্যান গোরের ছায়ে?
"আলী-আলী" হাঁকল রূপাই হুঙ্কারে তার গগন ফাটে,
হুঙ্কারে তার গর্জে বছির আগুন যেন ধরল কাঠে!
ঘুম হতে সব গাঁয়ের লোকে শুনল যেন রূপার বাড়ি ;
ডাক শুনে তার আসল ছুটে রহম চাচা, ছমির মিঞা,
আসল হেঁকে কাজেম খুনী নখে নখে আঁচড় দিয়া।
আসল হেঁকে গাঁয়ের মোড়ল মালকোছাতে কাপড় পড়ি,
এক নিমেষে গাঁয়ের লোকে রূপার বাড়ি ফেলল ভরি।
লম্ফে দাঁড়ায় ছমির লেঠেল, মমিনপুরের চর দখলে,
এক লাঠিতে একশ লোকেরমাথা যে জন আস্ ল দলে।
দাঁড়ায় গাঁয়ের ছমির বুড়ো, বয়স তাহার যদিও আশী,
গায়ে তাহার আজও আছে একশ লড়ার দাগের রাশি।

গর্জি উঠে গদাই ভূঁঞার ; মোহন ভূঁঞার ভাজন বেটা,
যার লাঠিতে মামুদপুরের নীল কুঠিতে লাগল লেঠা ।
সব গাঁর লোক এক হল আজ রূপার ছোট উঠান পরে,
নাগ-নাগিনী আসল যেন সাপ-খেলানো বাঁশীর স্বরে!
রূপা তখন বেরিয়ে তাদের বলল, "শোন ভাই সকলে,
গাজনা চরের ধানের জমি আর আমাদের নাই দখলে।"

বছির মামু বলছে খবর---মোল্লারা সব কাসকে নাকি ;
আধেক জমির ধান কেটেছে, কালকে যারা কাঁচির খোঁচায় :
আজকে তাদের নাকের ডগা বাঁধতে হবে লাঠির আগায়।"
থামল রূপাই---ঠাটা যেমন মেঘের বুকে বাণ হানিয়া,
নাগ-নাগিনীর ফণায় যেমন তুবড়ী বাঁশীর সুর হাঁকিয়া।
গর্জে উঠে গাঁয়ের লোকে, লাটিম হেন ঘোড়ায় লাঠি,
রোহিত মাছের মতন চলে, লাফিয়ে ফাটায় পায়ের মাটি।

রূপাই তাদের বেড়িয়ে বলে, "থাল বাজারে থাল বাজারে,
থাল বাজায়ে সড়কি ঘুরা হানরে লাঠি এক হাজারে।
হানরে লাঠি---হানরে কুঠার, গাছের ছ্যন্ আর রামদা ঘুরা,
হাতের মাথায় যা পাস যেথায় তাই লয়ে আজ আয় রে তোরা।"
"আলী! আলী! আলী! আলী!!!" রূপার যেন কণ্ঠ ফাটি,
ইস্রাফিলের শিঙ্গা বাজে কাঁপছে আকাশ কাঁপছে মাটি।
তারি সুরে সব লেঠেল লাঠির, পরে হানল লাঠি,
"আলী-আলী" শব্দে তাদের আকাশ যেন ভাঙবে ফাটি।
আগে আগে ছুটল রূপা---বোঁ বোঁ বোঁ সড়কি ঘোরে,
কাল সাপের ফণার মত বাবরী মাথায় চুল যে ওড়ে।
লল পাছে হাজার লেঠেল "আলী-আলী" শব্দ করি,
পায়ের ঘায়ে মাঠের ধূলো আকাশ বুঝি ফেলবে ভরি!
চলল তারা মাঠ পেরিয়ে, চলল তারা বিল ডেঙিয়ে,
কখন ছুটে কখন হেঁটে বুকে বুকে তাল ঠুকিয়ে।
চলল যেমন ঝড়ের দাপে ঘোলাট মেঘের দল ছুটে যায়,
বাও কুড়ানীর মতন তারা উড়িয়ে ধূল্ পথ ভরি হায়!
দুপুর বেলা এল রূপাই গাজনা চরের মাঠের পরে,
সঙ্গে এল হাজার লেঠেল সড়কি লাঠি হস্তে ধরে!
লম্ফে রূপা শূণ্যে উঠি পড়ল কুঁদে মাটির পরে,

থকল খানিক মাঠের মাটি দন্ত দিয়ে কামড়ে ধরে।
মাটির সাথে মুখ লাগায়ে, মাটির সাথে বুক লাগায়ে,
"আলী! আলী!" শব্দ করি মাটি বুঝি দ্যায় ফাটায়ে।
হাজার লেঠেল হুঙ্কারী কয় "আলী আলী হজরত আলী,"
সুর শুনে তার বন-গেঁয়োদের কর্ণে বুঝি লাগল তালি!
তারাও সবে আসল জুটে দলে দলে ভীম পালোয়ান,
"আলী আলী" শব্দে যেন পড়ল ভেঙে সকল গাঁখান!
সামনে চেয়ে দেখল রূপা সার বেঁধে সব আসছে তারা,
ওপার মাঠের কোল ঘেঁষে কে বাঁকা তীরে দিচ্ছে নাড়া।
রূপার দলে এগোয় যখন, তারা তখন পিছিয়ে চলে,
তারা আবার এগিয়ে এলে এরাও ইটে নানান কলে।
এমনি করে সাত আটবারে এগোন পিছন হল যখন
রূপা বলে, "এমন করে "কাইজা" করা হয় না কখন।"
তাল ঠুকিয়ে ছুটল রূপাই, ছুটল পাছে হাজার লাঠি,
"আলী-আলী --- হজরত আলী" কণ্ঠ তাদের যয় যে ফাটি।
তাল ঠুকিয়া পড়ল তারা বন-গেঁয়োদের দলের মাঝে,
লাঠির আগায় লাগল লাঠি, লাঠির আগায় সড়কি বাজে।
"মার মার মার" হাঁকল রূপা, --- "মার মার মার" ঘুরায় লাঠি,
ঘুরায় যেন তারি সাথে পায়ের তলে মাঠের মাটি।
আজ যেন সে মৃত্যু-জনম ইহার অনেক উপরে উঠে,
জীবনের এক সত্য মহান্ লাঠির আগায় নিচ্ছে লুটে!
মরণ যেন মুখোমুখি নাচছে তাহার নাচার তালে,
মহাকালের বাজছে বিষাণ আজকে ধরার প্রলয় কালে।
নাচে রূপা---নাচে রূপা--- লোহুর গাঙে সিনান করি,
মরণরে সে ফেলছে ছুড়ে রক্তমাখা হস্তে ধরি।
নাচে রূপা---নাচে রুপা---মুখে তাহার অট্টহাসি,
বক্ষে তাহার রক্ত নাচে, চক্ষে নাচে অগ্নিরাশি।

---হাড়ে হাড়ে নাচন তাহার, রোমে রোমে লাগছে নাচন,
কি যেন সে দেখেছে আজ, রুধতে নারে তারি মাতন।
বন-গেঁয়োরা পালিয়ে গেল, রূপার লোকও ফিরল বহু,
রূপা তবু নাচছে, গায়ে তাজা-খুনের হাসছে লোহু।

বার

রূপাই গিয়াছে 'কাইজা' করিতে সেই ত সকাল বেলা,
বউ সারাদিন পথ পানে চেয়ে, দেখেছে লোকার মেলা।
কত লোক আসে কত লোক যায়, সে কেন আসে না আজ,
তবে কি তাহার নসিব মন্দ, মাথায় ভাঙিবে বাজ!
বালাই, বালাই, ওই যে ওখানে কালো গাঁর পথ দিয়া,
আসিছে লোকটি, ওই কি রূপাই ? নেচে ওঠে তার হিয়া।
এলে পরে তারে খুব বকে দিবে, মাথায় ছোঁয়াবে হাত,
কিরা করাইবে লড়ায়ের নামে হবে না সে আর মাৎ।

আঁচলে চোখেরে বার বার মাজে, নারে না সে ত ও নয়,
আজকে তাহার কপালে কি আছে, কে তাহা ভাঙিয়া কয়।
লোহুর সাগরে সাতার কাটিয়া দিবস শেষের বেলা,
রাত্র-রাণীর কালো আঁচলেতে মুছিল দিনের খেলা।
পথে যে আঁধার পড়িল সাজুর মনে তার শত গুণ,
রাত এসে তা ব্যথার ঘায়েতে ছিটাইল যেন নুন!

ঘরের মেঝেতে সপটি ফেলায়ে বিছায়ে নক্সী-কাঁথা,
সেলাই করিতে বসিল যে সাজু একটু নোয়ায়ে মাথা।
পাতায় পাতায় খস্ খস্ খস্, শুনে কান খাড়া করে,
যারে চায় সে ত আসেনাক শুধু ভুল করে করে মরে।
তবু যদি পাতা খানিক না নড়ে, ভাল লাগেনাক তার ;
আলো হাতে লয়ে দূর পানে চায়, বার বার খুলে দ্বার।

কেন আসে নারে! সাজুর যদি গো পাখা আজ বিধি,
উড়িয়া যাইয়া দেখিয়া আসিত তাহার সোনার নিধি।
নক্সী-কাঁথায় আঁকিল যে সাজু অনেক নক্সী-ফুল,
প্রথমে যেদিন রূপারে সে দেখে, সে খুশির সমতুল।
আঁকিল তাদের বিয়ের বাসর, আঁকিল রূপার বাড়ি,
এমন সময় বাহিরে কে দেখে আসিতেছে তাড়াতাড়ি।

দুয়ার খুলিয়া দেখিল সে চেয়ে---রূপাই আসিছে বটে,
"এতক্ষণে এলে ? ভেবে ভেবে যেগো প্রাণ নাই মোর ঘটে।
আর জাইও না কাইজা করিতে, তুমি যাহাদের মারো,
তাদের ঘরে ত আছে কাঁচা বউ, ছেলেমেয়ে আছে কারো।"
রূপাই কহিল কাঁদিয়া, "বউগো ফুরায়েছে মোর সব,
রাতে ঘুম যেতে শুনিবে না আর রূপার বাঁশীর রব।
লড়ায়ে আজিকে কত মাথা আমি ভাঙিয়াছি দুই হাতে,
আগে বুঝি নাই তোমারো মাথার সিঁদুর ভেঙেছে তাতে।
লোহু লয়ে আজ সিনান করেছি, রক্তে ভেসেছে নদী,
বুকের মালা যে ভেসে যাবে তাতে আগে জানিতাম যদি!
আঁচলের সোনা খসে যাবে পথে আগে যদি জানতাম,
হায় হায় সখি, নারিনু বলিতে কি যে তবে করিতাম !"

বউ কেঁদে কয়, "কি হয়েছে বল, লাগিয়াছে বুঝি কোথা,
দেখি ! দেখি !! দেখি !!! কোথায় আঘাত, খুব বুঝু তার ব্যথা !"
"লাগিয়াছে বউ, খুব লাগিয়াছে, নহে নহে মোর গায়,
তোমার শাড়ীর আঁচল ছিঁড়েছে, কাঁকন ভেঙেছে হায়!
তোমার পায়ের ভাঙিয়াছে খাড়ু ছিঁড়েছে গলার হার,
তোমার আমার এই শেষ দেখা, বাঁশী বাজিবে না আর।
আজ 'কাইজায়' অপর পক্ষে খুন হইয়াছে বহু।
এই দেখ মোর কাপড়ে এখনো লাগিয়া রহিছে লহু।

থানার পুলিশ আসিছে হাঁকিয়া পিছে পিছে মোর ছুটি,
খোঁজ পেলে পরে এখনি আমার ধরে নিয়ে যাবে টুঁটি।
সাথীরা সকলে যে যাহার মত পালায়েছে যথা-তথা,
আমি আসিলাম তোমার সঙ্গে সেরে নিতে সব কথা।
আমার জন্য ভাবিনাক আমি, কঠিন ঝড়িয়া-বায়,
যে গাছ পড়িল, তাহার লতার কি হইবে আজি হায়!
হায় বনফুল, যেই ডালে তুই দিয়েছিলি পাতি বুক,
সে ডালেরি সাথে ভাঙিয়া পড়িল তোর সে সকল সুখ।
ঘরে যদি মোর মা থাকিত আজ তোমারে সঙ্গে করি,
বিনিদ্র রাত কাঁদিয়া কাটাত মোর কথা স্মরি স্মরি!

ভাই থাকিলেও ভাইয়ের বউরে রাখিত যতন করি,
তোমার ব্যথার আধেকটা তার আপনার বুকে ভরি।
আমি যে যাইব ভাবিনাক, সাথে যাইবে কপাল-লেখা,
এযে বড় ব্যথা! তোমারো কপালে এঁকে গেনু তারি রেখা!"
সাজু কেঁদে কয়, "সোনার পতিরে তুমি যে যাইবে ছাড়ি,
হয়ত তাহাতে মোর বুকখানা যাইতে চাহিবে ফাড়ি।
সে দুখেরে আমি ঢাকিয়া রাখিব বুকের আঁচল দিয়া,
এ পোড়া রূপেরে কি দিয়া ঢাকিব---ভেবে মরে মোর হিয়া।
তুমি চলে গেলে পাড়ার লোকে যে চাহিবে ইহার পানে,
তোমার গলার মালাখানি আমি লুকাইব কোন্ খানে!"

রূপা কয়, "সখি দীন দুঃখীর যারে ছাড়া কেহ নাই,
সেই আল্লার হাতে আজি আমি তোমারে সঁপিয়া যাই।
মাকড়ের আঁশে হস্তী যে বাঁধে, পাথর ভাসায় জলে,
তোমারে আজিকে সঁপিয়া গেলাম তাঁহার চরণ তলে।"

এমন সময় ঘরের খোপেতে মোরগ উঠিল ডাকি,

রূপা কয়, "সখি! যাই---যাই আমি---রাত বুঝি নাই বাকি!"
পায়ে পায়ে পায়ে কতদূর যায় ; সাজু কয়, " ওগো শোন,
আর কি গো নাই মোর কাছে তব বলিবার কথা কোন ?
দীঘল রজনী---দীঘল বরষ---দীঘল ব্যথার ভার,
আজ শেষ দিনে আর কোন কথা নাই তব বলিবার ?"
রূপা ফিরে কয়, "না কাঁদিয়া সখি, পারিলামনাক আর,
ক্ষমা কর মোর চোখের জলের নিশাল দেয়ার ধার।"

"এই শেষ কথা!" সাজু কহে কেঁদে, "বলিবে না আর কিছু ?"
খানিক চলিয়া থামিল রূপাই, কহিল চাহিয়া পিছু,
"মোর কথা যদি মনে পড়ে সখি, যদি কোন ব্যথা লাগে,
দুটি কালো চোখ সাজাইয়া নিও কাল কাজলের রাগে।
সিন্দুরখানি পরিও ললাটে---মোরে যদি পড়ে মনে,
রাঙা শাড়ীখানি পরিয়া সজনি চাহিও আরশী-কোণে।
মোর কথা যদি মনে পড়ে সখি, যতনে বাঁধিও চুল,
আলসে হেলিয়া খোপায় বাঁধিও মাঠের কলমী ফুল ।
যদি একা রাতে ঘুম নাহি আসে---না শুনি আমার বাঁশী,
বাহুখানি তুমি এলাইও সখি মুখে মেখে রাঙা হাসি ।
চেয়ো মাঠ পানে---গলায় গলায় দুলিবে নতুন ধান ;
কান পেতে থেকো, যদি শোনো কভু সেখায় আমার গান।
আর যদি সখি, মোরে ভালবাস মোর তরে লাগে মায়া,
মোর তরে কেঁদে ক্ষয় করিও না অমন সোনার কায়া!"

ঘরের খোপেতে মোরগ ডাকিল, কোকিল ডাকিল ডালে,
দিনের তরণী পূর্ব-সাগরে দুলে উঠে রাঙা পালে।
রূপা কহে, "তবে যাই যাই সখি, যেটুকু আধার বাকি,
তারি মাঝে আমি গহন বনেতে নিজেরে ফেলিব ঢাকি।"

পায়ে পায়ে পায়ে কতদূর যায়, তবু ফিরে ফিরে চায় ;
সাজুর ঘরেতে দীপ নিবু নিবু ভোরের উতল বায় ।

তেরো

একটি বছর হইয়াছে সেই রূপাই গিয়াছে চলি,
দিনে দিনে নব আশা লয়ে সাজুরে গিয়াছে ছলি ।
কাইজায় যারা গিয়াছিল গাঁয়, তারা ফিরিয়াছে বাড়ী,
শহরের জজ, মামলা হইতে সবারে দিয়াছে ছাড়ি।
স্বামীর বাড়ীতে একা মেয়ে সাজু কি করে থাকিতে পারে,
তাহার মায়ের নিকটে সকলে আনিয়া রাখিল তারে।
একটি বছর কেটেছে সাজুর একটি যুগের মত,
প্রতিদিন আসি, বুকখানি তার করিয়াছে শুধু ক্ষত ।

ও-গাঁয়ে রূপার ভাঙা ঘরখানি মেঘ ও বাতাসে হায়,
খুঁটি ভেঙে আজ হামাগুড়ি দিয়ে পড়েছে পথের গায় ।
প্রতি পলে পলে খসিয়া পড়িছে তাহার চালের ছানি,
তারও চেয়ে আজি জীর্ণ শীর্ণ সাজুর হৃদয়খানি ।
রাত দিন দুটি ভাই বোন যেন দুখেরই বাজায় বীণ।
কৃষাণীর মেয়ে, এতটুকু বুক, এতটুকু তার প্রাণ,
কি করিয়া সহে দুনিয়া জুড়িয়া অসহ দুখের দান!
কেন বিধি তারে এত দুখ দিল, কেন, কেন, হায় কেন,
মনের-মতন কাঁদায় তাহারে "পথের কাঙালী" হেন ?

সোঁতের শেহলা ভাসে সোঁতে সোঁতে, সোঁতে সোঁতে ভাসে পানা,
দুখের সাগরে ভাসিছে তেমনি সাজুর হৃদয়খানা ।
কোন্ জালুয়ার মাছ সে খেয়েছে নাহি দিয়ে তায় কড়ি,
তারি অভিশাপ ফিরেছে কি তার সকল পরাণ ভরি !
কাহার গাছের জালি কুমড়া সে ছিঁড়েছিল নিজ হাতে,

তাহারি ছোঁয়া কি লাগিয়াছে আজ তার জীবনের পাতে !
তোর দেশে বুঝি দয়া মায়া নাই, হা-রে নিদারুণ বিধি
কোন্ প্রাণে তুই কেড়ে নিয়ে গেলি তার আঁচলের নিধি ।
নয়ন হইতে উড়ে গেছে হায় তার নয়নের তোতা,
যে ব্যাথারে সাজু বহিতে পারে না, আজ তা রাখিবে কোথা ?

এমনি করিয়া কাঁদিয়া সাজুর সারাটি দিবস কাটে,
আমেনে কভু একা চেয়ে রয় দীঘল গাঁয়ের বাটে।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া সকাল যে কাটে---দুপুর কাটিয়া যায়,
সন্ধ্যার কোলে দীপ নিবু-নিবু সোনালী মেঘের নায়ে।
তবু ত আসে না ! বুকখানি সাজু নখে নখে আজ ধরে,
পারে যদি তবে ছিঁড়িয়া ফেলায় সন্ধ্যার কাল গোরে।
মেয়ের এমন দশা দেখে মার সুখ নাই কোন মনে,
রূপারে তোমরা দেখেছ কি কেউ, শুধায় সে জনে জনে।
গাঁয়ের সবাই অন্ধ হয়েছে, এত লোক হাটে যায়,
কোন দিন কিগো রূপাই তাদের চক্ষে পড়ে নি হায় !
খুব ভাল করে খোঁজে যেন তারে, বুড়ী ভাবে মনে মনে,
রূপাই কোথাও পলাইয়া আছে হয়ত হাটের কোণে।
ভাদ্র মাসেতে পাটের বেপারে কেউ কেউ যায় গাঁরষ
নানা দেশে তারা নাও বেয়ে যায় পদ্মানদীর পার।
জনে জনে বুড়ী বলে দেয়, "দেখ, যখন যখানে যাও,
রূপার তোমরা তালাস লইও, খোদার কছম খাও।"
বর্ষার শেষে আনন্দে তারা ফিরে আসে নায়ে নায়ে,
বুড়ী ডেকে কয়, "রূপারে তোমরা দেখ নাই কোন গাঁয়ে !"
বুড়ীর কথার উত্তর দিতে তারা নাহি পায় ভাষা,
কি করিয়া কহে, আর আসিবে না যে পাখি ছেড়েছে বাসা।

চৈত্র মাসেতে পশ্চিম হতে জন খাটিবার তরে,

মাথাল মাথায় বিদেশী চাষীরা সারা গাঁও ফেলে ভরে।
সাজুর মায়ে যে ডাকিয়া তাদের বসায় বাড়ির কাছে,
তামাক খাইতে হুঁকো এনে দ্যায়, জিজ্ঞাসা করে পাছে ;
"তোমরা কি কেউ রূপাই বলিয়া দেখেছ কোথাও কারে,
নিটল তাহার গঠন গাঠন, কথা কয় ভারে ভারে।"
এমনি করিয়া বলে বুড়ী কথা, তাহারা চাহিয়া রয়,---
রুপারে যে তারা দেখে নাই কোথা, কেমন করিয়া কয় !
যে গাছ ভেঙেছে ঝড়িয়া বাতাসে কেমন করিয়া হায়,
তারি ডালগুলো ভেঙে যাবে তারা কঠোর কুঠার-ঘায় ?

কেউ কেউ বলে, "তাহারি মতন দেখেছিন একজনে,
আমাদের সেই ছোট গাঁয় পথে চলে যেতে আনমনে।"
"আচ্ছা তাহারে সুধাও নি কেহ, কখন আসিবে বাড়ী,
পরদেশে সে যে কোম্ প্রাণে রয় আমার সাজুরে ছাড়ি ?"
গাঙে-পড়া-লোক যেমন করে তৃণটি আঁকড়ি ধরে,
তেমনি করিয়া চেয়ে রয় বুড়ী তাদের মুখের পরে।
মিথ্যা করেই তারা বলে, "সে যে আসিবে ভাদ্র মাসে,
খবর দিয়েছে, বুড়ী যেন আর কাঁদে না তাহার আশে।"
এত যে বেদনা তবু তারি মাঝে একটু আশার কথা,
মুহুর্তে যেন মুছাইয়া দেয় কত বরষের ব্যথা।
মেয়েরে ডাকিয়া বার বার কহে, "ভাবিস না মাগো আর,
বিদেশী চাষীরা কয়ে গেল মোর---খবর পেয়েছে তার।"
মেয়ে শুধু দুটি ভাষা-ভরা আঁখি ফিরাল মায়ের পানে ;
কত ব্যথা তার কমিল ইহাতে সেই তাহা আজ জানে।
গণিতে গণিতে শ্রাবণ কাটিল, আসিল ভাদ্র মাস,
বিরহী নারীর নয়নের জলে ভিজিল বুকের বাস।

আজকে আসিবে কালকে আসিবে, হায় নিদারুণ আশা,

ভোরের পাখির মতন শুধুই ভোরে ছেড়ে যায় বাসা ।
আজকে কত না কথা লয়ে যেন বাজিছে বুকের বীনে,
সেই যে প্রথম দেখিল রূপারে বদনা-বিয়ের দিনে।
তারপর সেই হাট-ফেরা পথে তারে দেখিবার তরে,
ছল করে সাজু দাঁড়ায়ে থাকিত গাঁয়ের পথের পরে ।
নানা ছুতো ধরি কত উপহার তারে যে দিত আনি,
সেই সব কথা আজ তার মনে করিতেছে কানাকানি।
সারা নদী ভরি জাল ফেলে জেলে যেমনি করিয়া টানে,
কখন উঠায়, কখন নামায়, যত লয় তার প্রাণে ;
তেমনি সে তার অতীতেরে আজি জালে জালে জড়াইয়া টানে,
যদি কোন কথা আজিকার দিনে কয়ে যায় নব-মানে।

আর যেন তার কোন কাজ নাই, অতীত আঁধার গাঙে,
ডুবারুর মত ডুবিয়া ডুবিয়া মানক মুকুতা মাঙে ।
এতটুকু মান, এতটুকু স্নেহ, এতটুকু হাসি খেলা,
তারি সাথে সাজু ভাসাইতে চায় কত না সুখের ভেলা !
হায় অভাগিনী ! সে ত নাহি জানে আগে যারা ছিল ফুল,
তারাই আজিকে ভুজঙ্গ হয়ে দহিছে প্রাণের মূল ।
যে বাঁশী শুনিয়া ঘুমাইত সাজু, আজি তার কথা স্মরি,
দহন নাগের গলা জড়াইয়া একা জাগে বিভাবরী।

মনে পড়ে আজ সেই শেষ দিনে রূপার বিদায় বাণী---
"মোর কথা যদি মনে পড়ে তবে পরিও সিঁদুরখানি।"
আরও মনে পড়ে, "দীন দুঃখীর যে ছাড়া ভরসা নাই,
সেই আল্লার চরণে আজিকে তোমারে সঁপিয়া যাই।"

হায় হায় পতি, তুমি ত জান না কি নিঠুর তার মন ;
সাজুর বেদনা সকলেই শোনে, শোনে না সে একজন।

গাছের পাতারা ঝড়ে পরে পথে, পশুপাখি কাঁদে বনে,
পাড়া প্রতিবেশী নিতি নিতি এসে কেঁদে যায় তারি সনে।
হায় রে বধির, তোর কানে আজ যায় না সাজুর কথা ;
কোথা গেলে সাজু জুড়াইবে এই বুক ভরা ব্যথা।
হায় হায় পতি, তুমি ত ছাড়িয়া রয়েছ দূরের দেশে,
আমার জীবন কি করে কাটিবে কয়ে যাও কাছে এসে !
দেখে যাও তুমি দেখে যাও পতি তোমার লাই-এর লতা,
পাতাগুলি তার উনিয়া পড়েছে লয়ে কি দারুণ ব্যথা।
হালের খেতেতে মন টিকিত না আধা কাজ ফেলি বাকি,
আমারে দেখিতে বাড়ি যে আসিতে করি কতরূপ ফাঁকি।
সেই মোরে ছেড়ে কি করে কাটাও দীর্ঘ বরষ মাস,
বলিতে বলিতে ব্যথার দহনে থেমে আসে যেন শ্বাস।

নক্সী-কাঁথাটি বিছাইয়া সাজু সারারাত আঁকে ছবি,
ও যেন তাহার গোপন ব্যথার বিরহিয়া এক কবি।
অনেক সুখের দুঃখের স্মৃতি ওরি বুকে আছে লেখা,
তার জীবনের ইতিহাসখানি কহিছে রেখায় রেখা।
এই কাঁথা যবে আরম্ভ করে তখন সে একদিন,
কৃষাণীর ঘরে আদরিনী মেয়ে সারা গায়ে সুখ-চিন।
স্বামী বসে তার বাঁশী বাজায়েছে, সিলাই করেছে সেজে ;
গুন গুন করে গান কভু রাঙা ঠোঁটেতে উঠেছে বেজে।

সেই কাঁথা আজো মেলিয়াছে সাজু যদিও সেদিন নাই,
সোনার স্বপন আজিকে তাহার পুড়িয়া হয়েছে ছাই।

খুব ধরে ধরে আঁকিল যে সাজু রূপার বিদায় ছবি,
খানিক যাইয়া ফিরে ফিরে আসা, আঁকিল সে তার সবি।
আঁকিল কাঁথায়---আলু থালু বেশে চাহিয়া কৃষাণ-নারী,

দেখিছে তাহার স্বামী তারে যায় জনমের মত ছাড়ি।
আঁকিতে আঁকিতে চোখে জল আসে, চাহনি যে যায় ধুয়ে,
বুকে কর হানি, কাঁথার উপরে পড়িল যে সাজু শুয়ে।
এমনি করিয়া বহুদিন যায়, মানুষে যত না সহে,
তার চেয়ে সাজু অসহ্য ব্যথা আপনার বুকে বহে।
তারপর শেষে এমনি হইল, বেদনার ঘায়ে ঘায়ে,
এমন সোনার তনুখানি তার ভাঙিল ঝরিয়া-বায়ে।
কি যে দারুণ রোগেতে ধরিল, উঠিতে পারে না আর ;
শিয়রে বসিয়া দুঃখিনী জননী মুছিল নয়ন-ধার।
হায় অভাগীর একটি মানিক ! খোদা তুমি ফিরে চাও,
এরে যদি নিবে তার আগে তুমি মায়েরে লইয়া যাও !
ফিরে চাও তুমি আল্লা রসুল ! রহমান তব নাম,
দুনিয়ায় আর কহিবে না কেহ তারে যদি হও বাম !

মেয়ে কয়, "মাগো ! তোমার বেদনা আমি সব জানি,
তার চেয়ে যেগো অসহ্য ব্যথা ভাঙে মোর বুকখানি !
সোনা মা আমার ! চক্ষু মুছিয়া কথা শোন, খাও মাথা,
ঘরের মেঝেয় মেলে ধর দেখি আমার নক্সী-কাঁথা !
একটু আমারে ধর দেখি মাগো, সূঁচ সুতা দাও হাতে,
শেষ ছবি খানা এঁকে দেখি যদি কোন সুখ হয় তাতে।"
পাণ্ডুর হাতে সূঁচ লয়ে সাজু আঁকে খুব ধীরে ধীরে,
আঁকিয়া আঁকিয়া আঁখিজল মুছে দেখে কত ফিরে ফিরে।

কাঁথার উপরে আঁকিল যে সাজু তাহার কবরখানি,
তারি কাছে এক গেঁয়ো রাখালের ছবিখানি দিল টানি ;
রাত আন্ধার কবরের পাশে বসি বিরহী বেশে,
অঝোরে বাজায় বাঁশের বাঁশীটি বুক যায় জলে ভেসে।
মনের মতন আঁকি এই ছবি দেখে বার বার করি,

দুটি পোড়া চোখ বারবার শুধু অশ্রুতে উঠে ভরি ।
দেখিয়া দেখিয়া ক্লান্ত হইয়া কহিল মায়েরে ডাকি,
"সোনা মা আমার! সত্যিই যদি তোরে দিয়ে যাই ফাঁকি ;
এই কাঁথাখানি বিছাইয়া দিও আমার কবর পরে,
ভোরের শিশির কাঁদিয়া কাঁদিয়া এরি বুকে যাবে ঝরে !
সে যদি গো আর ফিরে আসে কভু, তার নয়নের জল,
জানি জানি মোর কবরের মাটি ভিজাইবে অবিরল।
হয়ত আমার কবরের ঘুম ভেঙে যাবে মাগো তাতে,
হয়ত তাহারে কাঁদাইতে আমি জাগিব অনেক রাতে।
এ ব্যথা সে মাগো কেমনে সহিবে, বোলো তারে ভালো করে,
তার আঁখি জল ফেলে যেন এই নক্সী-কাঁথার পরে।
মোর যত ব্যথা, মোর যত কাঁদা এরি বুকে লিখে যাই,
আমি গেলে মোর কবরের গায়ে এরে মেলে দিও তাই !
মোর ব্যথা সাথে তার ব্যথাখানি দেখে যেন মিল করে,
জনমের মত সব কাঁদা আমি লিখে গেনু কাঁথা ভরে ।"
বলিতে বলিতে আর যে পারে না, জড়াইয়া আসে কথা,
অচেতন হয়ে পড়িল যে সাজু লয়ে কি দারুণ ব্যথা ।

কানের কাছেতে মুখ লয়ে মাতা ডাক ছাড়ি কেঁদে কয়,
"সাজু সাজু ! তুই মোরে ছেড়ে যাবি এই তোর মনে লয় ?"
"আল্লা রসুল ! আল্লা রসুল !" বুড়ী বলে হাত তুলে,
"দীন দুঃখীর শেষ কান্না এ, আজিকে যেয়ো না ভুলে !"
দুই হাতে বুড়ী জড়াইতে চায় আঁধার রাতের কালি,
উতলা বাতাস ধীরে ধীরে বয়ে যায়, সব খালি ! সব খালি !!
"সোনা সাজুরে, মুখ তুলে চাও, বলে যাও আজ মোরে,
তোমারে ছাড়িয়া কি করে যে দিন কাটিবে একেলা ঘরে !"

দুখিনী মায়ের কান্নায় আজি খোদার আরশ কাঁপে,
রাতের আঁধার জড়াজড়ি করে উতল হাওয়ার দাপে।

চৌদ্দ

আজো এই গাঁও অঝোরে চাহিয়া ওই গাঁওটির পানে,
নীরবে বসিয়া কোন্ কথা যেন কহিতেছে কানে কানে।
মধ্যে অথই শুনো মাঠখানি ফাটলে ফাটলে ফাটি,
ফাগুনের রোদে শুকাইছে যেন কি ব্যথারে মূক মাটি !
নিঠুর চাষীরা বুক হতে তার ধানের বসনখানি,
কোন্ সে বিরল পল্লীর ঘরে নিয়ে গেছে হায় টানি !

বাতাসের পায়ে বাজেনা আজিকে ঝল মল মল গান,
মাঠের ধূলায় পাক খেয়ে পড়ে কত যেন হয় ম্লান!
সোনার সীতারে হরেছে রাবণ, পল্লীর পথ পরে,
মুঠি মুঠি ধানে গহনা তাহার পড়িয়াছে বুঝি ঝরে!
মাঠে মাঠে কাঁদে কলমীর লতা, কাঁদে মটরের ফুল,
এই একা মাঠে কি করিয়া তারা রাখিবেগো জাতি-কুল।
লাঙল আজিকে হয়েছে পাগল, কঠিন মাটিরে চিরে,
বুকখানি তার নাড়িয়া নাড়িয়া ঢেলারে ভাঙিবে শিরে ।
তবু এই-গাঁও রহিয়াছে চেয়ে, ওই-গাঁওটির পানে,
কতদিন তারা এমনি কাটাবে কেবা তাহা আজ জানে।
মধ্যে লুটায় দিগন্ত-জোড়া নক্সী-কাঁথার মাঠ ;
সারা বুক ভরি কি কথা সে লিখি, নীরবে করিছে পাঠ!
এমন নাম ত শুনিনি মাঠের? যদি লাগে কারো ধাঁধাঁ,
যারে তারে তুমি শুধাইয়া নিও, নাই কোন এর বাঁধা।

সকলেই জানে সেই কোন্ কালে রূপা বলে এক চাষী,
ওই গাঁর এক মেয়ের প্রেমেতে গলায় পড়িল ফাঁসি।
বিয়েও তাদের হয়েছিল ভাই, কিন্তু কপাল-লেখা,
খন্ডাবে কেবা? দারুণ দুঃখ ভালে এঁকে গেল রেখা।
রূপা একদিন ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে গেল দূর দেশে,

তারি আশা-পথে চাহিয়া চাহিয়া বউটি মরিল শেষে।
মরিবার কালে বলে গিয়েছিল --- তাহার নক্সী-কাঁথা,
কবরের গায়ে মেলে দেয় যেন বিরহিণী তার মাতা!

বহুদিন পরে গাঁয়ের লোকেরা গভীর রাতের কালে,
শুনিল কে যেন বাজাইছে বাঁশী বেদনার তালে তালে।
প্রভাতে সকলে দেখিল আসিয়া সেই কবরের গায়,
রোগ পাণ্ডুর একটি বিদেশী মরিয়া রয়েছে হায়!
শিয়রের কাছে পড়ে আছে তার কখানা রঙীন শাড়ী,
রাঙা মেঘ বেয়ে দিবসের রবি যেন চলে গেছে বাড়ি!

সারা গায় তার জড়ায়ে রয়েছে সেই নক্সী-কাঁথা,---
আজও গাঁর লোকে বাঁশী বাজাইয়া গায় এ করুণ গাথা।

কেহ কেহ নাকি গভীর রাত্রে দেখেছে মাঠের পরে,---
মহা-শূণ্যেতে উড়িয়াছে কেবা নক্সী-কাথাটি ধরে ;
হাতে তার সেই বাঁশের বাঁশীটি বাজায় করুণ সুরে,
তারি ঢেউ লাগি এ-গাঁও ও-গাঁও গহন ব্যথায় ঝুরে।
সেই হতে গাঁর নামটি হয়েছে নক্সী-কাঁথার মাঠ,
ছেলে বুড়ো গাঁর সকলেই জানে ইহার করুণ পাঠ।